রাজেন্দ্র লাইব্রেরী

১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড

(ক্যানিং স্ট্রীট)

কলিকাতা - ১

সেদিন দুজনে

SEDIN DUJANE

(*A Bengali Novel*)

BY : BIDHAYAK BHATTACHARIYA

॥ এক ॥

যে কাহিনী বলছি সে আজ প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার।

তখন পথেঘাটে এমন বাস-মোটর-সাইকেল-রিক্‌শা-স্কুটার প্রভৃতির ছড়াছড়ি ছিল না। ছিলই না। তখন ঘোড়ার গাড়ির মর্যাদা ছিল। বড়লোকরা যাতায়াত করতেন ঘোড়ার গাড়িতে।

তখনকার এক মিস্ত্রী পবিবারের কাহিনী। যারা গরুর গাড়ির চাকা নির্মাণ করে জীবিকা-নির্বাহ করতো।

মুর্শিদাবাদ জেলার যে রাস্তাটা শহর থেকে পদ্মার ধার অবধি চলে গেছে, সেই রাস্তার ধারে নতুনগঞ্জ নামে একটি গ্রাম ছিল। বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের পশ্চিমে গঙ্গা, পূবে পথ। পথের ধারে হরিশ মিস্ত্রীর বাড়ি।

হরিশের চার ছেলে—এক মেয়ে। তিন ছেলেই বাপের সঙ্গে চাকা তৈরি করে। গিরীশ, শিরীষ অর্থাৎ শ্রীশ, ননী আর সব ছোট ছেলের নাম দুলাল। মেয়ের নাম সরোজিনী।

বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে মাঠ মতো অনেকখানি জায়গা। একপাশে চালাঘর, তাতে থাকে থাকে সাজানো গরুর গাড়ির চাকা। আর একধারে যন্ত্রপাতি—করাত, ছেনি ইত্যাদি।

ওই বাড়ির সামনে দিয়ে যখনই যাওয়া যেতো, তখনই দেখতে পাওয়া যেতো হরিশ মিস্ত্রী কিছু-না-কিছু একটা কাজ করছে।

আর রাস্তার পাশে অনেকগুলো বড় বড় গাছের গুঁড়ি জড়ো করা আছে, তারই একটার ওপর বসে বড়ছেলে গিরীশ বাপের থেলো হুঁকোটা একফাঁকে সরিয়ে নিয়ে এসে তামাক টানছে।

হরিশের স্ত্রীর কিছু-একটা নাম নিশ্চয় ছিল বিয়ের সময়, কিন্তু এখন তার নাম হয়ে গেছে ননীর মা। সেজছেলের নামের সঙ্গে মায়ের নাম কেন যুক্ত হলো—সেজছেলেই বা কেন এমন অহেতুক মর্যাদা পেল গ্রামবাসীদের কাছ থেকে, সে খবর কেউ জানে না।

তিন ছেলের পর সরোজিনী। এই ষোলোতে পড়েছে। মেয়েটা সুন্দরী। গায়ের রং শ্যামলা, কিন্তু মুখখানি বেশ সুকুমার, এবং যৌবনও ঔদ্ধত্যের লক্ষণ প্রকাশ করছে ইদানীং।

রাত্রি তখন এগারোটা।

খেতে বসেছিল হরিশ মিস্ত্রী। হঠাৎ স্ত্রীর কথায় দপ্ করে জ্বলে উঠলো। বললো—আমি হাজারবার তোকে মানা কোর‍্য়্যাছি নোন্য়্যার মা, যে ছুলালের ল্যাখাপড়া লিয়ে কুনো কথা তুই আমাকে বোলবিন্যা। ফের্ কথা বুলছিস্ ক্যানে?

—তা আমিও তো উয়ার মা! উয়ার ভাল-মন্দের কথা আমি কিছু বুল্‌বো না!

—না। ছোট ইস্‌কুল থেক্য়্যা পাস কোর‍্য়্যাছে, উয়াকে আমি বড় ইস্‌কুলে পড়াবো।

—বড় ইস্‌কুলে! বুলছো কিগো! ননীর মার চোখ বড় হলো। এরকম একটা অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাস করতে রাজী নয় সে। বললো—তাহেলে কি ছুল্য়্যাকে জাতব্যবসা করাবা না?

—না। খেতে খেতে আবার গর্জে উঠলো হরিশ মিস্ত্রী। —উয়াকে আমি বড় ইস্‌কুলে পড়াবো। তা'পর বহরমপুর কলেজে পড়াবো।

এইবার এতক্ষণ পরে হেসে উঠলো ননীর মা। বুঝলো কোন কারণে স্বামীর মাথা গরম হয়েছে। বললো—আজ কি চার পাঁচ জোড়া পেহা (গরুর গাড়ির চাকা) বেচ্য়্যাছো নাকি ?

একবার মুখ তুলে স্ত্রীকে দেখে নিয়ে আর দ্বিতীয় কোন কথা না বলে খেতে লাগলো হরিশ মিস্ত্রী। তারপর খাওয়া শেষ করে উঠে গেল। এ নিয়ে আর কোন কথা বলতে সাহসে কুলোয় না ননীর মার। পাঠশালা থেকে ভালভাবে পাস করেছে দুলাল। অতএব তার বাপ যদি তাকে বড় ইস্কুলে পড়ায়, তাতে তার কী বলার থাকতে পারে ?

কথাটা কানে গিয়েছিল বড়ছেলে মেজছেলে দুজনেরই। গিরীশ মায়ের কাছে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে, চাকা বিক্রির কাজের চাপ বেড়েছে, চার ভাই মিলে কাজ করলে অনেক সুবিধে হবে। বাবা এরকম পাগলামি করছে কেন ?

ননীর মা সমস্ত ব্যাপারটার ওপর বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। বললো—যা না, তোর ব্যাটাকে বল্‌গা না। কিন্তু ব্যাটাকে অর্থাৎ বাপকে বলার সাহস হলো না তার। ফলে দুলালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হরিশ তাকে বড় ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলো।

॥ দুই ॥

ঘাট থেকে কলসীতে জল ভরে গা ধুয়ে সদ্যোভিন্ন-যৌবনা সরোজিনী বাড়ি ফিরে আসছিল। এতদিন হরিশ মিস্ত্রীর মেয়ে সরোজিনীকে চোখ মেলে কেউ দেখেনি। হঠাৎ যেন সে এক নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো গাঁয়ের লোকজনের কাছে।

ঘাটে যাবার গলিটার মুখে প্রাণকুমার গোস্বামীর বাড়ি। গোঁসাইজীর বয়স হয়েছে। তা' পঞ্চাশ তো নিশ্চয়। তিনি কখনো কখনো রাস্তার দিকে বারান্দায় একলা বসে বসে নাম জপ করেন, আবার কখনো কখনো দেখা যায় দু'একজন সমবয়সী বন্ধু নিয়ে কোনদিন দাবা, কোনদিন পাশা খেলছেন। রোগা লম্বা মানুষটি। সর্বাঙ্গে তিলকসেবা। মিষ্টি মিষ্টি কথা। জপই করুন আর দাবা-পাশাই খেলুন, প্রাণকুমারের চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে কারুরই গঙ্গার ঘাটের গলিতে ঢোকবার উপায় নেই।

বিকেলে খানিক আগেই খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। দাওয়ায় প্রাণকুমার একাই বসে ছিলেন। এমন সময় দেখলেন কাঁখে কলসী নিয়ে সরোজিনী গঙ্গার দিকে আসছে। ভিজে শাড়ির বাঁকে বাঁকে লম্বা স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির অঙ্গের মোহসঞ্চারী ঝিলিক। সরোজিনী যে নারীজাতীয়া সেই তত্ত্বটাই যেন প্রাণকুমার আজ উপলব্ধি করলেন। চেয়েই রইলেন জপাবেশে আধবোজা চোখ মেলে। দৃষ্টিকোণ থেকে সরে যাবার আগে প্রাণকুমার ডাক দিলেন—সরো!

দাঁড়ালো সরোজিনী। হাসিমুখে প্রাণকুমারের দিকে চেয়ে বললো---কী বুলছেন দাদাঠাকুর?

সরোজিনীর মা প্রাণকুমারকে ডাকে—বাবাঠাকুর। কাজেই মায়ের বাবা সম্পর্কে দাদাঠাকুরই হবে।

— বলছি, ভিজলি কি বৃষ্টিতে, না গঙ্গায় ?

—দুটয়্যাতেই। মধুর হেসে বললো সরোজিনী।—যেতে যেতে বিষ্টি ভিজ্য়্যালো, তাই নেহ্যাও লিল্য়্যাম। ক্যানে গো ?

—না, বলছি, সময়টা তো ভাল নয়। বুকে সর্দি বসলে কষ্ট পাবি।

অজান্তেই নিজের সুপুষ্ট বুকটার দিকে চাইলো সরোজিনী। তারপর আবার হেসে বললো—না। বসবে না। তা' আপনিই বা ক্যানে খালি গায়ে এই ঠাণ্ডায় বোস্য়্যা আছেন দাদাঠাকুর ? ই-হাওয়াটা তো ভালো লয়। চাঁদিতে ঠাণ্ডা লাগবে। যেছি গো দাদাঠাকুর !

—আয়। বললেন প্রাণকুমার।—মাঝে মাঝে এলেও তো পারিস আমার নাটমন্দিরে! কীর্তন হয়, নামগান হয়, মাঝে-মধ্যে কথকতাও হয়। এসময় একটু-আধটু গোবিন্দের নাম শোনা ভাল। বুঝলি না ?

—আচ্ছা, মাকে যেয়্যা বুলছি। বললো সরোজিনী।—বুঢ়্যা মানুষ, আপনি ডেক্য়্যাছেন শুনলে খুশী হবে। এই বলে সরোজিনী চলতে লাগলো পথ দিয়ে। যতদূর দেখা গেল, প্রাণকুমার সেই দিকে চেয়েই রইলেন। মৃদু গলায় নিজের মনেই বললেন—আহা! ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার হয়ে এসেছে।

বাড়িতে ঢোকবার মুখে সরোজিনীর দেখা হয়ে গেল তার বাল্যবন্ধু সুহাসের সঙ্গে।

সুহাস তাদের পাশের বাড়ির ছেলে। বামুনবাড়ি। বাড়িতে শালগ্রাম আছেন। নিত্য অন্নভোগ। ননীর মা কাজে-কর্মে, কারণে-অকারণে সুহাসের মার কাছে যেতো। ঠাকুরের চরণামৃত, কোনদিন বা অন্নপ্রসাদ নিয়ে আসতো।

দু'বাড়ির মাঝখানে একটা পাঁচিলের ব্যবধান। যাতায়াতের সুবিধের জন্য সুহাস আর সরোজিনী ছেলেবেলায় বাড়ির পেছন দিকে প্রাচীরের কতকগুলো ইঁট খুলে নিয়েছিল। এখনও সেই নীচু জায়গাটা দিয়েই দু'বাড়ির যাওয়া আসা চলে।

প্রগাঢ় বন্ধুত্ব দুজনের। খেলতে খেলতে ছোটবেলায় সুহাস আর সরোজিনীর কতোবার যে মালাবদল হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ছেলের পড়ার চাইতে খেলার দিকে মন বেশী বলে সুহাসের বাবা যতীন চক্রবর্তী ছেলেকে তেরো বছর বয়সে রাজসাহীতে কাকার কাছে পাঠিয়ে দেন। যতীনের ছোটভাই রতীন চক্রবর্তী রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক। সে-বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা আছে, সেইজন্য যতীনবাবু ছেলেকে ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন সুহাসের তেরো বছর বয়স। কিন্তু তেরো বছরের ছেলে আর এগারো বছরের মেয়ে যাবার আগের দিন এমন কান্নাই কেঁদেছিল দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে, যে কান্না আধুনিক তরুণ-তরুণীর পক্ষে কাঁদা সম্ভব নয়।

সেই ছাড়াছাড়ি।

তারপর সুহাস ম্যাট্রিক পাস করেছে। কলেজে ভর্তি হয়েছে। আই-এ পরীক্ষা দিয়ে নতুনগঞ্জে ফিরেছে। আবার পাসের খবর-টবর বেরোলে চলে যাবে রাজসাহী।

তারপরে এই দেখা। গলিটার একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিল সুহাস। এমন সময় সেখানে জল নিয়ে সরোজিনী এসে পেছন থেকে সুহাসকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। কাঁখ থেকে জলের কলসীটা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। সে আস্তে আস্তে সুহাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুহাসও প্রথমে কীরকম বোকার মতো চেয়ে রইলো। শেষে সামলে নিয়ে বললো—সরো?

সরোজিনী ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বললো বটে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছে না। বোকার মতো সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সেই সুহাস? এ যে এক অপরূপ রূপবান যুবক! যেমন মাথায় লম্বা, তেমনি চমৎকার স্বাস্থ্য। তার চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড়।

—হাঁ করে চেয়ে দেখছো কি? বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি?

এইবার কথা ফুটলো সরোজিনীর। বললো—না না, বিশ্‌য়্যাস্ হবে না ক্যানে? কিন্তু তোমাকে আর চিন্‌হাই যায় না! কবে এল্‌য়্যা?

—এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। বললো সুহাস।

—এ্যাখুন থাক্‌বা না যাবা?

—না, আছি। মাস দুয়েক তো নিশ্চয় আছি। কিন্তু সরো, তোমাকেও আর চেনা যায় না।

—ক্যানে? কী বোদ্‌লিয়েছে আমার যে চিন্‌হাই যায় না বুলছো? চট্ করে নিজের দেহের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিষ্টি হেসে বললো সরোজিনী।

সুহাসও হাসলো। বললো—মজা দেখছ? আজ কিন্তু আমরা কেউ কাউকে 'তুই' বলতে পারছি না। আচ্ছা, এখন যাও—ভিজে

কাপড়ে বেশীক্ষণ থাকলে অসুখ করবে। আমি দেখা করবো তোমার সঙ্গে। এই বলে সুহাস সেখান থেকে সরে গেল।

সরোজিনী আরো একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে তার চলে যাওয়াটা দেখল। তারপর নিজের মনেই ফিক্ করে হেসে ঘরের দিকে চলে গেল।

ননী তার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল দিয়ে দিয়ে মাথার তেড়িটাকে বাগে আনছিল। পথের দিকটায় একটা জানলা আছে তার ঘরে। দাঁড়ালে পথ দেখা যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল বলে সে দেখতে পেয়েছিল গলির মুখে দাঁড়িয়ে সরোজিনী কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ননী একটু রগচটা। পিতা হরিশ মিস্ত্রীর এই গুণটা সে পেয়েছে।

সরোজিনী উঠোনে ঢুকে দেখলো তার মা তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিচ্ছে। মেয়ের দিকে চেয়ে বললো—আমি তো ভাবছিলাম তোকে কুম্হীরে লিয়ে গিয়েছে।

—কুম্হীরে লিবে ক্যানে? দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা বুলছিলাম। দাওয়ায় জলের কলসীটা নামিয়ে বললো সরোজিনী।

ননী ঘর থেকে বেরিয়ে বললে—গলির মুখে দাঁড়িয়ে কথা বুলছিলি—উ কোতিক্য়্যার দাদাঠাকুর? লহোবোর্য়্যাটা কে?

—লহোবোর্য়্যা ক্যানে হবে? উ তো সুহাস।

—সুহাস আবার কুন্ কুটুম?

—তুমি পেহা বানাওগা যাও। আমাদের বাম্হুন-বাড়ির সুহাস। যতীন মামার ব্যাটা।

ননী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মরা মাছের মতো চোখ করে বোনের দিকে চেয়ে বললো—ভোগা দিছিস না কী?

—ভোগা দিবো ক্যানে ? শুধাওগা না ! বলে তর-তর করে সরোজিনী উত্তর ভিটের ঘরের মধ্যে উঠে গেল। ননী যেন একটি চড় খেলো বোনের কাছে। কোন কথা না বলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সুহাস বাড়িতে এসে একটা গল্প লিখলো।

॥ তিন ॥

কয়েকদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল একটানা। ফলে পথঘাট কাদায় কাদাময়। ভগবানগোলা থেকে দুখানি গরুর গাড়ি আসছিল, তাদেরই চাকা ভেঙেছে। ফলে তারা হরিশ মিস্ত্রীর চালাঘরে আশ্রয় নিয়েছে, গাড়িতে নতুন চাকা লাগিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তারা দুখানি চাকার দর-দাম নিয়ে এমনই দরাদরি করতে লাগলো যে হরিশ মিস্ত্রীর মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে গেল। তবু খদ্দের লক্ষ্মী, তাই যথাসম্ভব গলাটাকে সংযত করে বললো—দরাদরি না করয়্যা চাকা দুট্য়্যা এমনি লিয়ে যান না ক্যানে মাহাশায়! ল্যাঠা চুকে যাবে।

—না না, তা লিবো ক্যানে? এমনি লিবো ক্যানে? ই ভালা ক্যামুন কথা! আমি আপনাকে দাম লিতে বুলছি। ল্যান, তবে বুঝ্য়্যা-সুঝ্য়্যা ল্যান।

গলা একপর্দা চড়লো হরিশের। বললো—আবার বুঝ্য়্যা কী লিবো? চল্লিশ কোর্য়্যাছি। লিবেন তো ল্যান, না লিবেন তো ঝামেলা করবেন না!

—না, ঝামেলা করবো ক্যানে? শুধু আর পাঁচটা টাকা কমিয়ে ল্যান মিস্ত্রীমশায়। তাহেলেই লিতে পারি। তাছাড়া লিয়েও তো আসিনি অত টাকা। পথের মধ্যিখানে গাড়ির চাকা এই লহরা লাগাবে, ইয়াই বা কে ভেব্য়্যাছিল বলুন! তা' এক কুড়ি পনেরো টাকা দিছি, দিয়ে ছ্যান।

কিছুক্ষণ চুপ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে থেকে হরিশ

বললো—দ্যান, টাকা দ্যান! লাগা রে গিরীশ, নোন্‌য়্যা—হাত লাগা। চাকা ছুট্‌য়্যা লাগিয়ে দে ব্যাটা।

ভাল ব্যবসা। এই গরুর গাড়ির চাকা বিক্রি করে সচ্ছল সংসার। বাড়ি-ঘর গরু-ছাগল—সবই ভাল। রাঢ়ে কিছু জমি আছে—তার থেকেও ধান-চাল মসূর-মুগ আসে। ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী পূজোও করে ননীর মা।

গিরীশের বিয়েও দিয়েছিল হরিশ। কিন্তু ভারী দুঃখের কথা—মেয়েটি বহরমপুরের। নতুনগঞ্জে এসে তার নাকি দম আটকে আসছিল, ফলে মাসের মধ্যে দিন-কুড়ি সে বাপের বাড়িতে থাকে। দশ দিনের জন্মে আসে শ্বশুরবাড়িতে। সেও খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে। দিনরাত কেবল খুঁত-খুঁত করে। এটা পারব না, সেটা পারব না। ঘাট থেকে জল আনতে পারব না। অভ্যেস নেই। শশিমুখী নাম। তার বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল। খাগড়া বাজারে হাতির দাঁতের দোকান আছে। বড় দুই ভাই আর বাপ—তিনজনেই কাজ করে দোকানে।

একদিন শশিমুখীকে রান্না করতে বলেছিল ননীর মা। খেতে বসে হরিশ ভাত মুখে দিয়ে চুপ করে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। ডাকলো—নোন্‌য়্যার মা!

—কী বুলছো? বলে দাওয়ায় উঠে এল বাড়ির গিন্নী।

—আজ ইসব রেঁধ্‌য়্যাছে কে?

—ক্যানে?

—গরুর খাবার হোয়্যাছে! বলে পুত্রবধূ বসে ছিল কাছে, তার দিকে চেয়ে হরিশ বললো—তুমার বাবাকে পাঠিয়ে দ্যাও তরকারিটা। মেয়্যা ক্যামুন নুন খাওয়াছে শ্বশুরকে বুঝ্যা লিবে।

তোর খাওয়ার গুষ্টিকে বেচি! বলে উঠে গিয়ে আঁচিয়ে বাইরে কারখানায় চলে গেল হরিশ।

ননীর মা ছেলের বৌয়ের দিকে চেয়ে বললো—বাপের বাড়িতে কি রাঁধতেও শিখায়নি তুমাকে? ছেলে-পিল্যয়্যারাও যদি খেতে না পায় তবে কী হবে আজ বোলোধিনি!

—কী আবার হবে! ঠোঁট উল্টে বললো শশিমুখী।—দোকান থেক্যা কচুরী জিল্যয়্যাপি কিনে লিয়ে এসে খাক্। আমি কী করবো? আমি তো আগেই বুলেছিল্যয়্যাম রাঁধতে জানিন্যয়্যা।

গিরীশ এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। স্ত্রীর কথা কানে যেতেই চেঁচিয়ে বললো—কচুরী জিল্যয়্যাপির পয়সা কি তোর বাবার কাছ থেক্যয়্যা চেহ্যা লিয়ে আসবা?

লেগে গেল গোলমাল। চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, গোলমাল! চিল-চীৎকারে পাড়ার লোকজন ছুটে এল। কাঁদতে কাঁদতেই শশিমুখী বললো—আজ বিক্যয়্যাল চার্ট্যার গাড়ীতে আমি খাগড়া চলে যেছি।

—যা না ক্যানে! ফুট্যয়্যানি মারছিস্ কার কাছে? চলে যা। গরম হয়ে বললো গিরীশ।

গোলমাল শুনে পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে যতীন চক্রবর্তী চলে এসেছিলেন এ বাড়িতে। তিনি অনেক করে বোঝালেন সবাইকে। ফলে সেদিনের মত ঠাণ্ডা হলো।

বিকেলে ননীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে ভগীরথপুর থেকে কুটুম এল। তার জন্য রান্নাবান্না সবই করল ননীর মা নিজে। সাহায্য করলো সরোজিনী। সরোর বয়স অল্প হলে কী হবে, সে রান্নার

ব্যাপারে মায়ের মতোই পটু। তাছাড়া সবাই জানে রান্নাটা সরোজিনী সুহাসের মার কাছে বসে বসে শিখেছে।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর কথা হলো আগামী ফাল্গুনে ননীর বিয়ে হবে ভগীরথপুরে। শহরের মেয়ের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে ননীর মার। সংসারের কাজকর্ম জানে, বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করবে—শান্ত স্বভাব, মিষ্টি কথা,—এমন মেয়েই চাই।

সরোজিনীর জন্যে একটা ভালো পাত্রের কথা বলা হলো। ভগীরথপুরের মিস্ত্রী বললো—কোলকাতায় আছে ছেলে, তবে যোগাযোগ করতে হবে সেখানে। কথাবার্তা বলতে হবে। খুব একটা চাপ দিলে তো পার্ব্যানা তোমরা?

—না না। বললো হরিশ।

—কোল্কাতায় মেয়্যার বিহ্যা দিবার ইচ্ছ্যা নাই আমার।

—ক্যানে? চোখ লাল করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললো হরিশ।

—ক্যানে আবার কী! সিখানে শুন্য়াছি দিনরাত আলো জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়। সূয্যো দেখা যায় না। চাঁদ নাকি উঠেই না। মেয়্যা আমার খাম হয়্যা যাবে।

—চাঁদ উঠে না? হরিশ বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে চিরকালই কমজোর। চিন্তিত মুখে বললো—হ্যাঁ কুটুম, চাঁদ না উঠলে আমাবস্স্যা পুন্নিম্যা ইসব কী কর্য়্যা বুঝা যাবে?

কুটুমও প্রায় হরিশের মতোই। তবু খুব বিজ্ঞের মতো বললো—উয়া তো জানিন্য়্যা। আচ্ছা, আমি শুধিয়ে লিবো। তাছাড়া চাঁদ আবার কী কাজে লাগ্বে হে কুটুম? আলোর বাহারের জন্যই তো? তা সিখানে তো বিজলী বাতিই আছে। শুধাবো।

প্রসঙ্গটা পরিষ্কার হলো না। সরোজিনী বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে

বলে দরজার আড়াল থেকে শুনছিল। চাঁদ না ওঠার কথা তার একদম ভাল লাগলো না।

ভাঙা প্রাচীরের ধারেই কথা হয়ে গিয়েছিল আজ বিকেলে একটু সকাল সকাল গঙ্গার ধারে যাবে দুজনে। তারপর ঘাট থেকে দক্ষিণে সরে গিয়ে একটু নির্জন জায়গা দেখে মনের কথা বলা যাবে।

তাই হলো।

সবাই ঘুমোচ্ছে।

বাইরের কারখানায় একটা অর্ধসমাপ্ত গরুর গাড়ির চাকায় হেলান দিয়ে হরিশ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। গিরীশ ও ননী নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছে। সরোজিনী দাওয়া থেকে পেতলের কলসীটা কাঁখে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। বাড়ির মধ্যেটাও ফাঁকা। বৌদি ঘুমোচ্ছে। মা গেছে সুহাসের মার সঙ্গে গল্প করতে। সরোজিনী বেরোলো যখন, বেলা তখন তিনটে।

নির্জন গঙ্গার ধার।

চেয়ে দেখলো সরোজিনী, কেউ কোথাও নেই। পাড়ার বৌ-ঝিদের ভিড় আরো পরে জমবে। আস্তে আস্তে গঙ্গার পাড় দিয়ে এক-পা এক-পা করে দক্ষিণ দিকে চললো সরোজিনী। ছেলেবেলায় কী ভীষণ ভয় করতো এই সব জায়গায় আসতে। একবার মনে আছে গাং-শালিকের বাচ্চা ধরতে সে আর সুহাস অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। বোশেখ মাস। বেলা চারটার পর

থেকে শুরু হলো কাল-বোশেখীর ঝড় আর বৃষ্টি। পীরের থানের বড় গাছটার তলায় দুজনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে ভিজেছে আর কেঁপেছে। আশেপাশে মড়-মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে। গঙ্গার ওপারে বালির চরের ওপর বাজ পড়লো। নিঃশব্দে নিরুপায় হয়ে দুটি কিশোর-কিশোরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলো।

সেদিন বাড়ি ফিরে মার বকে কোথায় আছি! দুজনেরই গায়ের ছাল-চামড়া বলে কিছু ছিল না।

জঙ্গলের মধ্যে গাছের ঘন ছায়ায় বসে কোথায় যেন ডাহুক ডাকছে। অনেক দূর এসেছে। কিন্তু কোথায় সুহাস? দূরে পীরতলা দেখা যাচ্ছে। আজো আকাশে মেঘ মেঘ করছে, হয়তো একচোট ঝড়-বৃষ্টি আজও হবে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে যেই ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, অমনি একটা ঝোপের পাশ থেকে ফিস-ফিস করে আওয়াজ এলো —সরো!

সুহাস বেরিয়ে এল।

হাসলো সরোজিনী। বললো—সেই ছোটবেলার মতো। না?

—হ্যাঁ।

—ভয় পেলয়্যাম না তো!

—তাই দেখছি। সুহাস হেসে বললো।

একটা গাছের গুঁড়ির ওপর দুজনে বসলো। তারপর শুরু হলো কথা। অকারণ অবারণ কথা। কথার যেন আর শেষ নেই। কথা বলতে বলতে কতোবার যে সরোজিনী সেই ছোটবেলার মতো সুহাসকে ধাক্কা মেরেছে তার ঠিক নেই। রাজসাহীর কথা, কাকার বাড়িতে কে কে আছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সুহাস কী করে, কী দিয়ে ভাত খায়,—সব জেনে নিলো সরোজিনী।

সুহাসও সরোজিনীর কাছে এক এক করে সব কথা জেনে নিলো। এমনকি তার নতুন কোন ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে কিনা, এক ফাঁকে তাও জেনে নিলো সুহাস। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুজনের কথা শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ সরোজিনী বললো—জানো, কোল-ক্যাতায় আমার বিহ্যার কথা হোছে?

—তোমার? ভালই হবে। আমি বি-এ পাস করে এম-এ পড়তে কোলকাতায় যাবো, তখন দেখা হবে।

—কী কর্‌য়্যা জান্‌ব্যা আমার ঠিকানা?

—তুমি জানিয়ে দিও।

—আচ্ছা। একটু থেমে বললো—তুমাকে একটা কথা শুধাবো?

—বলো!

—কোলক্যাতায় নাকি চাঁদ উঠে না?

জোরে হেসে উঠলো সুহাস। বললো—এসব কথা কে বলেছে? কোলকাতায় আমাদের নতুনগঞ্জের মতোই চাঁদ ওঠে। তবে সেখানে তো সব বড় বড় বাড়ি। তাছাড়া রাত্তিরে আলোয় আলোময় হয়ে থাকে শহরটা। সেইজন্যে চোখ তুলে কেউ দ্যাখে না।

—ওমা! চাঁদ দ্যাখে না কিগো! পূন্নিম্যার অমুন ভাল চাঁদ শুধু শুধুই চলে যায়! কেউ দ্যাখে না! চিন্তিত হয়ে পড়লো সরোজিনী। তারপর একটু ভেবে বললো—আমার যদি কোল-ক্যাতায় বিহ্যা হয় তো আমি নিশ্চয় দেখবো।

—হ্যাঁ। তাহলেই চাঁদের জন্ম সার্থক হবে।

ঘাটের দিক থেকে মেয়েদের কলকোলাহল, হাসিঠাট্টা শোনা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালো সুহাস। বললো—আমি এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাই। তুমি জল ভরে বাড়ি যাও। কেমন?

—কাল আস্‌ব্যা ?

—যদি হুকুম করো !

—এই ত্যাখো ! হুকুম ক্যানে গো ? তোমার ইচ্‌ছ্যা করে না ?

—করে। সব সময় মনে হয় কাছে বসিয়ে তোমাকে দেখি ! কিন্তু— ! এই বলে সরে এসে এক কাণ্ড করে বসলো সুহাস। সবলে সরোজিনীকে জড়িয়ে ধরে, তার ঠোঁটের ওপর একটি চুমু খেলো।

তটস্থ হয়ে সরোজিনী সরে গেল। হাত দিয়ে মুখটা মুছে ফেলে বললো—ইটা কী কোর্‌ল্যা ?

—চুমু খেলাম তোমাকে।

—ক্যানে ? জাত গেল যে তোমার ? ছুত্‌য়্যারের মেয়্যার মুখে মুখ দিল্‌য়্যা তুমি ! ছি ছি ! তুমি যে বাম্‌হুন্‌ গো !

—যে জাত তোমাকে পেতে বাধা দেয়, সে জাত যাওয়াই ভালো।

অনেকগুলো বাংলা উপন্যাস পড়ে ফেলেছে এর মধ্যে সুহাস। তারই কোন একটার কথা ফস্‌ করে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

সরোজিনী কাছে এসে হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নিল সুহাসের।

সুহাস চলে গেল।

সরোজিনী কিন্তু বসে রইলো। কী একটা ঘটে গেছে যেন, এইভাবে অন্যমনস্ক হয়ে বসেই রইলো কাঠের গুঁড়িতে। চুমো তাকে এর আগে কেউ খায়নি। এর স্বাদ, এর অনুভূতি এই প্রথম। থেকে থেকে সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠছে। সুহাসের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ভাবলো সরোজিনী, তাহলে চুমো খেলে কি জাত যায় না ?

॥ চার ॥

হাতে যখন কাজকর্ম থাকে না, তখন চুপ করে হুঁকাটা হাতে নিয়ে টানা লম্বা পথটার দিকে চেয়ে বসে থাকে হরিশ মিস্ত্রী। খুশী হয়েই চেয়ে থাকে। এখুনি হয়তো দূর থেকে শোনা যাবে গরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ—-ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর—। গাড়ি এসে থামবে কারখানার সামনে। ক্লান্ত গরু হুটোকে জিয়ালা গাছটার সঙ্গে বেঁধে গাড়োয়ান এসে বসবে হরিশের সামনে। হুঁকা থেকে কলকেটা তুলে তার হাতে দেবে হরিশ। হু'হাতের মাঝখানে ধরে টেনে হু'চারবার কেশে কলকেটা ফেরত দিয়ে বসবে গাড়োয়ান। তারপর বলবে—মিস্ত্রীমশায়। ইবার ই শালার চাকা না বদলালে রেতবিরেতে আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে পড়ে মরবো আমি।

—বদলিয়ে ল্যাও না ক্যানে?

—লিবো লিবো। আর হু'চার দিন পরে আসবো। এস্‌য়্যা হুট্‌য়্যা চাকাকেই বদ্‌লিয়ে লিবো। হুখ্যান গাড়ী আছে, উয়াতেই খাওয়াদাওয়া—উয়াতেই সব। চাকা না হলে চলে কখ্যনো?

তারপর কথা বলতে বলতেই শুয়ে পড়বে গাড়োয়ান কারখানার মাটির মেঝেতে। বকবক করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে।—গিয়্যা-ছিলাম ভরতপুরে। আমাদের কিষ্টপুরের লবীন শেখের বিটীকে শ্বশুরবাড়িতে পঁহুছিয়ে দিতে। পস্‌সুর আগের দিন বের্‌হিয়েছি, আজ ঘুরছি। ঘর যেতে যেতে যাকে বলে একবারে সাঁজ্‌ পেরিয়্যা যাবে। তা যাক্‌গা। হুট্‌য়্যা হুট্‌য়্যা চারটা টাকা দিবে বোল্‌য়্যাছে ভাড়া, আর এক টাকা খাওয়া। তা পাঁচটা টাকা মন্দ কি মিস্তিরী

আইজ্‌ক্যালকার দিনে। চাল তো শুনছি টাকায় দশ সের হয়ে যেছে—।

পথের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে হরিশ বলে—কই না। শুনিনি তো। হবেও বা। যা দিনকাল পোড়্‌য়্যাছে, হলেই হলো।

—তাই বুল্‌ছি। বলে চলে গাড়োয়ান।—সাঢ়ে ত্যারো সের থেক্‌য়্যা দশ সের টাকায় হলে গরীব ক্যামুন কোর্‌য়্যা বাঁচবে মিস্তিরী?

এমনি নিত্যদিন।

রোজই এক-আধখানা গরুর গাড়ি আসে কারখানায়। চাকা বদলায়, জল খায়, তামাক খায়—পয়সাকড়ি দিয়ে চলে যায়।

এই গোটা তল্লাটে হরিশ মিস্ত্রীর চাকার বড় কদর। কোনরকমে গাড়িতে দুখানা চাকা লাগিয়ে নিতে পারলে নিশ্চিন্দি। সহজে ভাঙবে না।

এক একদিন দল বেঁধে যখন ভগবানগোলা, লালগোলা, কৃষ্ণপুর থেকে গরুর গাড়ি বাঁশ নিয়ে, কাঠ নিয়ে, বিচালি নিয়ে, আমের সময় আম নিয়ে চলে যায়, হরিশ বসে বসে দেখে। ওই দলের মধ্যেও সে নিজের তৈরী চাকা চিনতে পারে। যদি কোনটা খারাপ দেখে তখনি চেঁচিয়ে বলে—আরে ইসমাইল শেখ, তোর চাকাটা বদলিয়ে লিয়ে যাস্‌। লড়বড় লড়বড় করছে যে!

—আসবো আসবো মিস্তিরী। মহরম পরবের পর বদলিয়ে লিয়ে যাবো।

আবার কোন কোন দিন খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে রাঢ় থেকে গরুর গাড়ি দল বেঁধে আসে, সেদিন হরিশ গিরীশ আর ননীর দুপুরে খাওয়া হয় না। সৃষ্টির আনন্দে যেন মেতে ওঠে এরা। দিনের শেষে ভাল রোজগার হয়। রাতে ননীর মার

হাতে আশীটা টাকা দিয়ে হরিশ বলে—ভাল কোরয়্যা বাক্সে তুল্য়্যা রাখ্।

—একখানি কাপুড় ইবার কিনে ছ্যাও না ক্যানে?

—এ্যাখুন ক্যানে? পূজ্য়্যায়—পূজ্য়্যায় ভাল কাপড় কিনে দিব।

খুশী হয়ে যায় ননীর মা। স্বামী এই যে বলেছে দেবো, এতেই যেন পাওয়া হ'য়ে যায় তার।

দিন চলে যায়।

যাবার দিন এগিয়ে আসে সুহাসের। রাজসাহী থেকে কাকা লিখেছেন দেরি না করিয়া চলিয়া আসিবা।

সামনের সোমবার যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রত্যেক দিন ওরা দেখা করছে—গঙ্গার ধারে পীরের থানের কাছে সেই ঝাঁকড়া অশ্বত্থগাছতলাটায়, যার নীচে প্রকাণ্ড একটা আমের গুঁড়ি পড়ে আছে।

প্রতিদিন দেখা হলে একবার, আর যাবার সময়—এই দুবার সুহাস চুমু খায় সরোজিনীকে। আজকাল সরোজিনী ওতে আর লজ্জা পায় না, ভয় পায় না। বলে—ই সব কুথায় শিখ্ল্যা?

—শেখাবার লোক আছে।

—তারাই শিখায়?

—হ্যাঁ।

—চুম্য়্যা খাবার জন্যে উখানে মেয়্যাছেল্য়্যাও আছে?

—দূর। তাই থাকে নাকি? এই বলে একটু থেমে সুহাস

বলে—আচ্ছা আমাদের ছেলেবেলার কথা সব তোর মনে আছে সরো ?

—ওমা ! মুনে থাকবে না ক্যানে ? সবই মুনে আছে ।

—কতবার আমরা মালাবদল করে বিয়ে করেছি, মনে আছে ? কতবার আমি হয়েছি বর, তুই হয়েছিস বৌ, মনে আছে ? আর একবার তুই দু'দিন কথা বলিসনি বলে আমি তোর পায়ে ধরেছিলাম, মনে আছে ?

ভারী সুন্দর হাসে সরোজিনী । সাজানো দাঁতের সারি ঝকঝক করে উঠলো । বললো—এই—এইবার—এতদিন পরে গিয়্যা ঠিক হলো ।

—কী ঠিক হলো ?

—এই যে আমাকে 'তুই' বলে কথা বুলছো। তুমি তুমি কোর্‌য়্যা কথা বোল্‌ত্যা, আমার মুনে হতো কাকে না কাকে বুলছো ? আমাকে বুলছো বোল্‌য়্যা মুনেই হতো না। আজ গিয়্যা ঠিক হলো।

কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে সুহাস বললো—পান খেয়েছিস বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—পান খেলে তোকে এত ভাল দেখায়। তোকে ফেলে রেখে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না সরো। আমার মনে হচ্ছে— তোকে আমার বুকের সঙ্গে দিনরাত চেপে ধরে রাখি, কিন্তু কী করবো বল্। পাস তো করতেই হবে।

—ওমা! তা হবে না? তা যাও না ক্যানে! আবার যখন আস্‌ব্যা—

—তখন যদি এসে দেখি তোর বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?

ম্লান হাসলো সরোজিনী। বললো—তাহেলে আর কী হবে? ইখানে এসে বোসো, ছুটির ক'দিন। আমাকে মুনে কোরো। এই যে বোল্ল্যা কোলক্যাতায় পঢ়তে যাবা, তখুন ছ্যাখা হবে।

—তোর ঠিকানাটা নিশ্চয় জানাস। সে কী করে?

—কে?

—ওই যার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

—কী জানি! শুন্য়্যাছি ইস্কুলে মাস্টারী না কি—!

—বাঃ! তাহলে তো লেখাপড়াও জানে।

—হবে বা। ঠোঁট উল্টে বললো সরোজিনী।

আরো কয়েকদিন এইভাবে দেখা করার পর চলে গেল সুহাস।

যাবার ঠিক আগের দিন সরোজিনীকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরতেই সে কাঁদতে আরম্ভ করলো। কেন কাঁদছে বলতে পারছে না, কিন্তু তার চোখের জলে সুহাসের জামার বুকের কাছটা রীতিমতো ভিজে গেল।

—আচ্ছা, শূদ্দু রে কি বাম্হুন্ হতে পারে না?

—পারে।

—তবে আমাকে বাম্হুন্ কোর্য়্যা ল্যাও না ক্যানে?

—কী করবি তুই বামুন হয়ে?

—তুমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। সাহস হোছে না, না?

এই বলে চোখের জলের মধ্যে দিয়েই হাসলো সরোজিনী।

পরদিন সকালের ট্রেনে সুহাস চলে গেল।

লালগোলাঘাট থেকে পদ্মা পার হয়ে গোদাগাড়ীঘাট··· রাজসাহী।

॥ পাঁচ ॥

আর একটি ছেলের চোখ ছিল সরোজিনীর ওপর। সে নতুনগঞ্জের উমেশ দত্তের ছোটছেলে শংকর। সরোজিনী যখন পাঠশালায় পড়তো, তখন একসঙ্গে পড়তো ওরা। তখন থেকেই পরিচয়-মেলামেশা। সুহাসের মতো খেলাঘরের খেলা শংকর খেলেনি। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী তার যেন বদলে যেতে লাগলো। চোদ্দ বছর থেকেই হঠাৎ সরোজিনী যুবতী হয়ে গেল। পুষ্পিত হয়ে উঠলো তার তনুদেহ। নিটোল-সুঠাম হয়ে উঠলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এমনিতেই মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ননীর মা তাকে কোথাও বেরোতে দেয় না। শুধু জল আনতে হয় গঙ্গার ঘাট থেকে।

সুহাস চলে যাবার দিন কয়েক পরে—

দুপুরবেলায় জলের প্রয়োজন হওয়াতে সরোজিনী কলসীটা নিয়ে জল আনতে চলে গেল।

খাঁ-খাঁ করছে রোদ্দুর।

সাইকেলে চেপে শংকর কোথায় যেন গিয়েছিল। ফিরে আসার পথে দেখা হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে বললো—সরো, কেমন আছিস ?

—ভাল। আপনি ভাল তো ?

—এই মরেছে! আমাকে আপনি কেন রে ? আমাকে তো তুমি বলতিস।

—তা হোক। এখন বড়ো হয়ে গিয়েছেন তো।

—সুহাস চলে গিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—আবার কবে আসবে ?

—কী কোর্য়্যা বুলবো ?

—তুই জানিস না ?

—না।

—সুহাস থাকলে তো মজাটা একাই লুটবে। তা আমরাও তো তোর সঙ্গে পড়েছি। আমাদেরও কিছু ভাগ দে!

—ইসব ক্যামুনধারা কথা বুলছেন ?

—ঠিক কথাই বলছি। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিন্দাবনলীলা তো করলি। সুহাস তো থাকে না ইখানে—আমরা থাকি, আমাদের কথা একটু ভাব।

—ছি ছি, ইসব কী বুলছেন শংকরদাদা!

—না বোল্য়্যা পারছিন্য়্যা। তোকে দেখলে মাথার ঠিক থাকে না সরো। ছোটজাতের ঘরে এ্যামুন ম্যেয়া হয় না।

—জাত তুল্য়্যা কথা বুলবেন না!

চোখে জল এসে গেছে সরোজিনীর। সে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

—তাহলে দয়া হবে না বলছিস ? পেছন থেকে শংকর বললো।

সরোজিনীর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। সে কোন কথার জবাব না দিয়ে বাড়ির গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

একি আপদ! আর কোন কথা নেই ? শুধু ওই এক কথা ? জল আনা বন্ধ করে দেবে নাকি ? না। তাহলে তার মার কষ্ট হবে। তবে একটা কাজ করবে সে। হয় খুব ভোরে জল নিয়ে আসবে, নইলে সন্ধ্যের পর। অথচ এ এমন একটা ব্যাপার যে কাউকে বলা যাবে না।

ব্যবসার ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে হরিশের। কয়েকটা মাস মনে হলো যেন জেলার সমস্ত গরুর গাড়ির চাকা ভেঙে গেছে, আর এই দু' তিন মাসের মধ্যেই সব গাড়িতে নতুন চাকা লাগাতে হবে।

টাকা হাতে পেয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—কিছু গয়না গড়িয়ে নিল হরিশ। ননীর মার গলার হার ছিল না, একগাছা হার গড়িয়ে দিল।

কোলকাতায় সম্বন্ধ যেটা হচ্ছিলো, তারা এসে দেখে গেল সরোজিনীকে। পছন্দও হলো। কিন্তু কিছু টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে একটু কথা চলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থেকে পছন্দ করে একটি মেয়ে দেখে এসে ননীর বিয়ে দিল হরিশ মিস্ত্রী। মেয়েটির রং ফর্সা। স্বভাবটিও মিষ্টি। নাম অমিয়ারানী।

অমিয়ারানীকে অনেকদিন থেকেই চেনে হরিশ। ব্যবসাসূত্রে রঘুনাথগঞ্জে গিয়ে অমিয়াকে দেখে আসে, পছন্দও হয়ে যায়। অমিয়া নতুনগঞ্জে শ্বশুরঘর করতে এল।

কথাই ছিল হরিশ পুত্রবধূকে খুব বেশী বাপের বাড়িতে পাঠাতে পারবে না। কেননা বড়বৌকে নিয়ে সুখ হয়নি, কাজেই মেজবৌয়ের ওপর পড়বে সব ভার। তাই অমিয়া আসতেই তাকে শাশুড়ী পই পই করে সব বুঝিয়ে দিল—কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে। সে কী কাজ করে, ননদ সরোজিনী সংসারের কী কাজ করে, শ্বশুর ভাসুর দেওর কী দিয়ে ভাত খেতে ভালবাসে,— এই অবধি বলে বড়বৌয়ের উল্লেখ করে বললো—আর আমার বড় ব্যাটার বৌ কী করে না করে উয়াকেই শুধিয়ে লিও।

হেসে ফেললো নতুন বৌ। চাপাগলায় বললো—ক্যানে ? দিদির কাছে কী শুধাবো ? কিছু শুধাতে হবে না। আমি তো সব জানি।

—তবে তাই করগা। বলে ননীর মা অন্যদিকে চলে যায়।

গ্রামের প্রান্তে হরিশের বাড়ি। প্রায় শেষ বাড়িই বলা যেতে পারে। রাস্তার এপাশে বাড়ি, ওপাশে বিরাট মাঠ। তাল আর খেজুর গাছে ভর্তি। সেই দিকে চেয়ে দুপুরবেলায় চুপ করে বসে থাকে হরিশ। গোটা পাঁচ ছয় তালগাছ। নিয়মিত একটা লোক এসে গাছে ওঠে, রস নিয়ে যায়, যাবার আগে শূন্য ভাঁড় বেঁধে দিয়ে যায়।

কাজ হাতে না থাকলে সেই দিকে চেয়ে হরিশ ভাবে, ওই গাছগুলোর রস একদিন ফুরিয়ে যাবে, তখন আর লোকটা এদিক দিয়ে যাবে না। ঠিক মানুষেরই মতো। তার মতো।

এই যে হরিশকে আজ এত যত্ন করে তার কারণ সে টাকা আনতে পারছে। টাকাই তো রস। যেদিন অক্ষম হয়ে পড়বে সেদিন তার রোগশয্যার পাশে কেউ উঁকি দিয়েও দেখবে না। এ সে নিশ্চয় জানে। সংসারের নিয়মই এই। ভাবতে ভাবতে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে হরিশ মিস্ত্রী। নিজের মনেই বলে—মরুকগা যাক্। যে যার কপাল লিয়্যা এস্য়্যাছে।

কিন্তু যতই সাবধান হোক অমিয়া, শশিমুখীর সঙ্গে লেগে গেল একদিন। নিজের বাপের বাড়িতে হ্যানোত্যানো আছে, বাড়িতে ঝি আছে, চাকর আছে—শুনতে শুনতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে অমিয়ার। সে বলে—দিদি, কাহুন বাড়িতে গিয়্যা তো দেখ্য়্যা আসিনি কার কী আছে না আছে।

—তাহেলে কি তুমি বুলছো আমি মিছ্য়্যা কথা বুলছি ?

—না না, মিছ্য়্যা কথা বুলব্যা ক্যানে ? তেবে—

—না না, এ্যামুনধারা কথাবাত্ রা আমার ভাল লাগে না।

—কার বাপের কত আছে উয়া তো জানাই আছে।

—কী বুললি তুই?

—কিছুই বুলিনি। তুমি খ্যামা গ্যাও।

ব্যস্। দুই জায়ে কথা বন্ধ হয়ে গেল। কার বাপের কত টাকা আছে তা নিয়ে আর তর্ক হলো না। সালিশ বিচারও কেউ চাইলো না কারো কাছে। কিন্তু নতুন বৌয়ের খাটুনি এবং কাজের ধারা দেখে ধন্য ধন্য পড়ে গেল পাড়ায়।

সরোজিনী কিন্তু লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। সে চুপিচুপি নতুন বৌকে জিজ্ঞাসা করলো।

অমিয়া মুখ ভার করে বললো—দিদির মনটা বড্ডাই খারাপ। বাপের পয়সা আছে কি না আছে উয়া লিয়্যা কাজিয়া কোর্য়্যা কিছু লাভ আছে? বোলো ঠাকুরঝি। তুমার বাপের টাকাকড়ি আছে, আমার বাপের নাই। কিন্তু তোমার বাপ আর আমার বাপ একই কাজ করে—সেই কী বলে গিয়্যা হাতীর দাঁতের কাজ। আমার শ্বশুরও খারাপ কাজ করে না, পেহ্যা বানায়। তা কুন্থ কথা শুনবে না, খালি দিনরাত কটরমটর কোর্য়্যা মটর চিব্য়্যাছে। উয়া আর ভাল লাগে না ঠাকুরঝি।

সরোজিনী মেজবৌয়ের সব কথা শুনে আস্তে আস্তে বললো—ক্যানে যে বৌদিদি এ্যামুন করে—! বলতে বলতে চলে গেল অন্যদিকে।

অমিয়া কাজের মেয়ে। সে বাপের বাড়িতে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করতো। মার কোলে বাচ্চা ভাই, কাজেই মা সংসারের কাজ করবার সময় পায় না। অমিয়াই বড়। ছোট ছোট চার পাঁচটি ভাই-বোনের দেখাশোনা সেই করতো।

কিন্তু বিয়ের পর ননীর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। সে কারখানাতেও যেতে চায় না। ঘরেই বসে থাকে। ভাল কাপড় জামা পরে চুল আঁচড়ে থেলো হুঁকোতে কল্কে চাপিয়ে ঘরের মধ্যেই বসে থাকে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—বৌ কাজে ব্যস্ত। এক মুহূর্ত সময় নেই তার ঘরে ঢোকবার। তবু ননী বসে থাকে। ক্বচিৎ কখনো অমিয়া ঘরে ঢুকলে তার আঁচল টেনে ধরে।

বিব্রত অমিয়া বলে—আরে, তুমি করছো কি মিস্তিরী! এখুনি ঠাকুরঝি দেখ্‌য়্যা ফেলবে, তারপর চিল্‌হাবে। ছাড়ো।

—চিল্‌হাক না ক্যানে!

—না না, ছাড়ো। আমার লজ্জা করে না বুজি?

—দূর শালী! লজ্জা করবে ক্যানে? আমি কি পরপুরুষ যে—

হেসে ফেলে অমিয়া। বলে—পেহ্যা বানানো ছেড়্‌য়্যা দিলয়্যা বুঝি? বাবা যখন বকবে তখন মজা বুঝ্‌ব্যা।

—পেহ্যা বানাতে আমার ভাল লাগে না। বলে ননী।

—তবে কি ভাল লাগে?

—ভাল লাগে তোকে কাছে বসিয়ে চব্বিশ পহর দেখতে।

—ধুৎ। ছাড়ো!

—না।

—ছাড়ো না গো!

—না।

আরো শক্ত করে অমিয়ার আঁচল চেপে ধরে ননী। নিরুপায় অমিয়া তখন স্বামীর মুখে ছোট্ট একটি পুরস্কারের চিহ্ন এঁকে দিয়ে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

ঘটনাটা ক্রমশঃ হরিশের চোখে পড়ে। ছেলের এই নৈষ্কর্ম্য

আর পত্নীপ্রীতি দেখে সে খেতে বসে বৌকে বলে—শালার ছেল্য়্যাটা একদম বেহুদ্দা। চব্বিশ পহর বৌয়ের কাছে বোস্য়্যা থাকতে ভালও লাগে ?

—ক্যানে ? তুমি কী কোর্ত্যা ? ডালের বাটিটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে ননীর মা।

—এইরকম কোর্ত্যাম না।

—এইরকমই কোর্ত্যা। বরং ইয়ার চাইতে বেশী।

আর কোন কথা বলে না হরিশ মিস্ত্রী। মাথা নীচু করে গপ-গপ করে ভাতের গ্রাস মুখে তোলে।

মুখ ফিরিয়ে ননীর মা হাসে। তার মনে পড়ে যৌবনকালে হরিশও ঠিক এমনি করতো। তার শ্বশুর শাশুড়ীও ঠিক এমনি করেই বকতেন ছেলেকে। হরিশ সেকথা কানেও তুলতো না। কতোদিন যে কতো কাণ্ড হয়েছে। একদিন তো বাপ ধরে বেদম ঠ্যাঙালো হরিশকে। হরিশ কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—আমি তো পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিইনি !

এই বোধহয় নিয়ম। বোধহয় অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এমনিই করে। কাজেই ননীর চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকায় দোষের কিছু নেই।

॥ ছয় ॥

মাঘ মাস। তীব্র শীত পড়েছে। পেহ্মা নির্মাণের কাজ চলেছে পুরোদমে। এই সময় বেশী কাজ করে রাখে হরিশ। কেননা বোশেখ মাস থেকেই গাড়ির চাকা ভাঙতে শুরু করে। কিছুটা গরমের জন্যও বটে, আবার কিছুটা রাস্তাঘাট উঁচুনীচু থাকার ফলে সেই এবড়োখেবড়ো পথে চাকার পরমায়ু আপনা থেকেই কমে যায়।

অবশেষে সরোজিনীর বিয়ের ফুল ফুটলো।

বর কোলকাতা থেকেই এলো। সঙ্গে জন দশেক বরযাত্রী। যতীনবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্বিঘ্নে বিয়ে দেওয়ালেন।

কিছুটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কন্যাপক্ষের নিয়ম বরযাত্রীদের ভাত খাওয়ানো। কিন্তু কোলকাতার বরযাত্রীরা রাত্রে ভাত খেতে অভ্যস্ত নয়। ফলে সব আবার নতুন করে যোগাড় করে লুচি খাওয়ানো হলো। তাতেও এক ফ্যাসাদ। বড় বড় কাঁসার থালার মতো লুচি, এবং তরকারিগুলোতেও নুন নেই। ছেলের বন্ধু একজন প্রশ্ন করলো যতীনবাবুকে—একি মশায়? সব আলুনি যে!

—মুর্শিদাবাদের তাই নিয়ম।

—খামোখা এরকম দলছাড়া গোত্রছাড়া নিয়ম করতে গেলেন কেন?

হাসলেন যতীনবাবু। বললেন—আমরা মুর্শিদাবাদের লোকেরা আর অতিথিকে নুন খাওয়াই না।

—কেন? কবে থেকে এই নিয়ম হলো?

—মীরজাফরের নিমকহারামির পর থেকে।

—ও! বলে চুপ করে গেল বন্ধুর দল। কারণ আজই বিকেলে তারা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছে।

সকালে গাড়ি থেকে নেমেছে বরযাত্রীর দল। দুপুরেই তাদের ঝোঁক চাপলো হাজারদুয়ারী দেখবে। ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে দেওয়া হলো। সবাই ঘুরে ঘুরে সব দেখেশুনে জাফরাগঞ্জের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় খেয়াল হলো যে মীরজাফরের বাড়িটাও এই ফাঁকে দেখে নেবে তারা। গাড়ি থেকে একজনকে প্রশ্ন করা হলো—মশাই, এখানে মীরজাফরের বাড়িটা কোথায়?

যাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি একজন সাধারণ মুসলমান পথচারী। কিছুক্ষণ হাঁ করে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—বলতে পারবো না।

এইভাবে আর একজন, তারপর আর একজন করে প্রায় চার পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করা হলো। শেষ লোকটি একটি মিষ্টির দোকানের সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলো—চাচা, ইখানে মীরজাফর মিঞার বাড়িটা কতি গো?

দোকানী কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বরযাত্রীদের প্রশ্ন করলো—মীরজাফর মিঞা? বুলতে পারবো না মহাশয়। চকে কি লতুন এস্যাছেন?

—আরে, দূর মশয়! একজন বরযাত্রী চটে গিয়ে বললো—তিনি ইতিহাসের মানুষ। সিরাজকে যিনি—

—ও হো! চেঁচিয়ে উঠলো দোকানী।—আপনারা নিমকহারাম দেউড়ির কথা বুলছেন? তা উয়াই বুলোননা ক্যানে। মীরজাফর-টাফর কী বুলছেন?

—কী মুশকিল! তিনি তো—

—না না। বুলতে হবে—নিমকহারাম দেউড়ি। নাম-ফাম আমরা জানি না।

সমগ্র জাতি এইভাবে একটা মানুষকে ধিক্কার দেয়—এটা খুবই আশ্চর্য। কাজেই যতীনবাবু যখন বললেন, আমরা মুর্শিদাবাদের লোকেরা অতিথিকে আর নুন খাওয়াই না, তখন আর অবাক লাগেনি বরযাত্রীদের।

সরোজিনী রাজসাহীতে চিঠি লিখেছিল সুহাসকে।

চিঠির জবাব দিয়েছিল সুহাস। লিখেছিল—তোমরা সুখী হও। আনন্দে ঘরসংসার করো। স্বামী তোমার মনের মতো হোক। খুব ইচ্ছে ছিল নতুনগঞ্জে যাবার। কিন্তু উপায় নেই। কেননা পড়াশোনার অসম্ভব চাপ। তোমার কোলকাতার ঠিকানাটা আমাকে জানিয়ো।—ইতি তোমার ছেলেবেলার বন্ধু, সুহাস।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে খুব কেঁদেছিল সরোজিনী। এক এক করে মনে পড়ে গঙ্গার ধারের সেই নিভৃত সাক্ষাৎ। সেই অপরূপ অনুভূতি। সেই সর্বাঙ্গ শিরশির-করা শিহরণ। কে জানে বর ভাল হবে না মন্দ হবে। কে জানে কেমন হবে শ্বশুরবাড়ির লোক। যাই হোক, তবু তাকেই তো মেনে নিতে হবে।

মহাসমারোহে সরোজিনী পাত্রস্থ হলো।

ঠিক দু'মাস পরে···

স্টেশন থেকে নতুনগঞ্জ অবধি আমের মুকুলের গন্ধে ভরা

নতুনগঞ্জের পথটা দিয়ে বাড়িরই গরুর গাড়িতে চেপে সরোজিনী এক মাসের জন্যে বেড়াতে এলো।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে সরোজিনীর। সে মাথায় একটু বড় হয়েছে। গায়ের রং অনেক ফরসা হয়ে গেছে। মুখখানি যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

দু'দিন পরে জল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় প্রাণকুমার গোঁসাইজীর সঙ্গে দেখা হলো সরোজিনীর। তিনি যথারীতি বারান্দায় বসে হাতপাখা চালিয়ে নিজে নিজেই হাওয়া খাচ্ছিলেন।

—ক্যামুন আছেন দাদাঠাকুর? বললো সরোজিনী।

—আরে কে? আমাদের সরো না?

—হ্যাঁ গো!

—কী বলছিস?

—শুধাছিল্যাম্ ক্যামুন আছেন?

—আমি ভাল নেই। তুই কবে এলি?

—আমি? পরশু দিন্ক্যা।

—আয় না। বোস না এখানে একটু! বললেন গোঁসাইজী।

চারদিক চেয়ে বললো সরোজিনী—দেরী হয়ে যাবে যে দাদাঠাকুর!

—আরে না! দেরী হবে ক্যানে? আয় বোস।

এই বলে মেঝেটার ওপর একবার হাত বুলিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে বললেন—বোস।

জলের কলসীটা দাওয়ায় রেখে প্রাণকুমারের সামনে বসলো সরোজিনী। গোঁসাইজী কিছুক্ষণ তাকে দেখলেন লুব্ধ চোখে। তারপর বললেন—ক্যামুন লাগছে?

—কী ক্যামুন লাগছে ? হেসে ফেললো সরোজিনী।

—আহা! নতুন জীবন, নতুন সুখ, নতুন ঠাঁই, নতুন মানুষ—ইসব লাগছে ক্যামুন ?

—উয়াই শুধাছেন ?

—হ্যাঁরে !

—আপনার ক্যামুন লেগেছিল দাদাঠাকুর ? দিদিঠ্যাগ্‌র্যানকে যখন ঘরে লিয়ে এসেছিলেন তখন ক্যামুন লেগেছিল ?

ঢোঁক গিললেন প্রাণকুমার। একটু কারণও ছিল। নতুনগঞ্জের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে এ খবর গোপন ছিল না যে গোঁসাইগিন্নী রীতিমতো মুখরা ছিলেন। কু-লোকে বলে, তারা নাকি গোঁসাই-গিন্নীকে স্বামীকে তাঁরই খড়ম দিয়ে প্রহার করতেও দেখেছে। কাজেই প্রশ্নটায় একটু হোঁচট খেলেন বইকি প্রাণকুমার। তবু যথাসম্ভব মুখের রেখাগুলিকে স্বাভাবিক রেখে হেসে বললেন—সে যা ছিল, তা ছিলই। সে কথা কি পাঁচজনকে বলা যায় ? কাজেই সে মনে মনেই থাক। তবে হ্যাঁ, বিয়ে হবার পর একটুআধটু আনন্দ হয়েছিল বইকি !

ফিক্ করে হেসে বললো সরোজিনী—তাহেলেই বুঝে ল্যান দাদাঠাকুর আনন্দ হয়্যাছিলো কি না।

—হুঁ। কী করে তোর স্বামী ?

—মাস্টারি।

—পাঠশালায় ?

—ওমা! পাঠশালায় ক্যানে হবে গো ? বড় ইস্কুলে। হেডমাস্টারের পরেই উয়ার জায়গা।

—তাহলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। উয়াই।

—হুঁ। বলে একটুকাল চুপ করে থেকে গোঁসাই বললেন—থাকবি এখন ?

—না। একমাস থাকবো বোলয়্যা এসয়্যাছি।

—বেশ বেশ। তা—কোলকাতার বালাম চালে আর কলের জলে তোর চেহারাটাও বেশ খোল্‌তাই হয়েছে। বুঝলি ?

—অমন কোর্‌য়্যা চাহিছেন ক্যানে ? লজর লেগ্‌য়্যা যাবে যে! এই বলে বুকের কাপড়চোপড় সামান্য টেনেটুনে দিয়ে সরোজিনী উঠে পড়লো।

—সন্ধ্যের পর একদিন আয়। কিছু কথা আছে তোর সঙ্গে।

—আসবো। বলে সরোজিনী চলতে শুরু করলো।

—কবে আসবি সেটা তো বলে গেলি না ? পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললেন গোঁসাইজী।

চলতে চলতে এদিকে না চেয়ে পেছন ফিরেই বলতে বলতে চলে গেল—পোস্‌সু।

শংকর হাল ছাড়েনি। সেও সরো ফিরে এসেছে শুনে দেখা করলো। বললো সব বুঝিয়ে। আরো বললো—তুই যদি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাস, তাহলে মার বাক্সে জমি কেনার জন্যে যে দু'হাজার টাকা রেখেছে সেইটে নিয়ে পালিয়ে যাব।

—যেয়্যা ?

—যেয়ে আবার কী ? আমরাও কোলকাতাতেই যাব। সেখানে গিয়ে একটা চাকরিবাকরি যোগাড় করে নেবো। তারপর দুজনে থাকা যাবে আনন্দ করে! কী বল্‌ ? যাবি ?

—তা কথা হোচ্ছে—আগেই পালাবার দরকার কী? তুমি আগে কোলক্যাতায় যাও, চাকরি যোগাড় করো, তো আমাকে খবর দিও। হোক্?

—তাহলে তুই যাবি?

—যাবোই বল্‌ছিনু্য়্যা, তবে তখুন ভাববো।

—তোর কোলকাতার ঠিকানা দে।

—বাবার কাছে আছে। যাবার সময় লিয়ে লিও।

—তুই বলবি না?

—আরে আমার উসব মনে নাই। কত নম্বর যেন। কী একটা ইস্‌টিট্।

—বাদুড়বাগান। আমি জানি। নম্বরটা জানি না। ঠিক আছে। আমি খোঁজ করে নেব।

—তাই লিও।

পরের দিন ঘাটে জল ভরতে গিয়ে সরোজিনী দেখলো শংকর দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে সরোজিনীকে একলা পেয়ে বললো—কাল আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি?

—কতি?

—নসীপুরে তুলসীবিয়ের মেলা আছে। যাবি?

—না।

—কেন?

—মা বকবে। কোলক্যাতার উয়ারা জানতে পারলে খারাপ হবে। তুমি যাও না ক্যানে। একলাই দেখ্য়্যা এসোগা।

গোঁ গোঁ করতে করতে শংকর চলে গেল।

হাসতে লাগলো সরোজিনী।

পুলের ধারের মণ্ডল কাকা ঘাটে নামতে নামতে সরোজিনীকে

একা একা হাসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বললো—কী হলো সরো? ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে একা একা হাসছিস কেন? কী হলো?

—কিছু হয়নি মন্‌ডোল কাকা। এমনিই হাসছিল্যাম।

—শংকর কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ। উয়ার সঙ্গে আমাকে পালিয়ে যেতে বলছিল।

—কী সর্বনাশ! সে কি রে! তুই কী বললি?

—আমি আর কী বুলবো? ওই বললো—ওই শুনলো। শংকর একটু পাগল আছে—না মন্‌ডোল কাকা?

—সেয়ানা পাগল রে মা! এ সবই হলো সেয়ানা পাগল! কেবল সুন্দর মেয়েদের দিকে চোখ। কোন্‌দিন যে কার সব্বোনাশ করবে তার ঠিক নাই। তুই যেন ওর কথায় কান দিস না মা!

—না কাকা!

—হ্যাঁ মা, সাবধান। অনেক পয়সা খরচ করে বিয়ে দিয়েছে তোর বাপ। সুন্দর জামাই। কী দুঃখ তোর? কেন খামোখা পালিয়ে যাবি ওই হতভাগার সঙ্গে?

খিলখিল করে হেসে উঠলো সরোজিনী। বললো—আপনারও কি মাথা খারাপ হলো নাকি মন্‌ডোল কাকা? কে যেছে উয়ার সঙ্গে? তার আগে গলায় কলসী বেঁধ্য়্যা জলে ডুবে মরবো আমি। যাবার হোলে তো আগেই যেত্‌ত্যাম্।

কিন্তু তবু কোথায় যেন মনের মধ্যে ঝিমঝিম করে। এই যে তাকে নিয়ে পুরুষের স্বপ্নরচনা, এই যে সবাই মিলে সুন্দর সুন্দর বলে চারদিকে একটা রব উঠেছে, এ বলছে—আমার কাছে একবার আসিস, ও বলছে—রাত্তিরে দেখা করবো, সে বলছে—আমার সঙ্গে পালিয়ে চল,—একটু একটু নেশা লাগে বইকি মনে। নারীজন্মের জন্য যেন একটা গর্ববোধ জাগে।

॥ সাত ॥

বৌয়ের নেশা অনেক কেটে গেছে ননীর। সে ঘর থেকে বেরিয়ে আবার কাজে যোগ দিয়েছে।

শশিমুখীর বাপের বাড়িতেও বেশ কিছু অদলবদল হয়েছে। বাপ মারা গিয়েছে। ভায়েরা স্পষ্টই বলে দিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই থাকা ভাল শশিমুখীর। অতএব শশিমুখী শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসে আর যাই করুক ঝগড়াঝাঁটি করেনি। ফলে শাশুড়ী খুব সুখী। অমিয়ার তো কথাই নেই, এমনিতেই সে ভাল মেয়ে। কাজেই হরিশের সংসারে আবার শান্তি ফিরে এল।

সেদিন কারখানায় কাজ করতে করতে হরিশ সেই কথাই বলছিল গিরীশ আর ননীকে—আমি আর ক'দিন বেটা! কাজকম্মো শিখে ল্যাও। বলি চালাতে হবে, না, হবে না? ছেল্য়্যাপুল্য়্যা হবে—এবার তো ঘর ভরে যাবে। আর ছোটভাইয়ের কথা বাদ ছ্যাও। উ ল্যাখাপড়া শিখছে। নিজেই নিজের ব্যবস্থা কোর্য়্যা লিবে।

এইভাবে দিন কাটতে থাকে।

এক মাস পরে জামাই আসে নতুনগঞ্জে। ছুদিন নতুনগঞ্জে থেকে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে সরোজিনীকে নিয়ে চলে যায়।

এই ছু'দিনের মধ্যে শংকর আসে দেখা করতে। বলে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—আসুন, আসুন। বলে, নতুন জামাই তারাপদ ভাস্কর। 'ভাস্কর' ওদের উপাধি।

শংকরকে খাতির করে বসায় তারাপদ।

শংকর বলে—আপনার স্ত্রী সরোজিনী আর আমি একসঙ্গে পাঠশালায় পড়েছি। আমার নাম শংকর।

—আচ্ছা। আপনি তাহলে সরোজের বন্ধু?

—হ্যাঁ। আপনি কোলকাতায় কী চাকরি করেন?

—আমি একটা হাইস্কুলের অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার।

আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর শংকর বুঝলো, এর সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলায় বিপদ আছে। ভদ্রলোক অন্য কোন কথা বলতে জানেই না। খালি লেখাপড়া, পরীক্ষা, ছাত্রদের মতিগতি—এসব নিয়ে আলোচনা করতেই ভালবাসে। অন্যমনস্ক টাইপের মানুষ।

—সরো আপনাকে সেবাযত্ন করে তো?

—অ্যাঁ! বলে এক প্রসঙ্গ থেকে আর এক প্রসঙ্গে নেমে আসে তারাপদ। হেসে বলে—হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমার বাড়িতে তো অন্য কোন লোক নেই। শুধু ও আর আমি। না করলে কে করবে? তাছাড়া সরোজ খুব ভাল মেয়ে।

—বাড়িতে অন্য কেউ থাকে না?

—না। কেষ্টনগরের বাড়িতে সবাই আছেন। কিন্তু কোলকাতায় আমরা স্বামী স্ত্রী থাকি।

—বাদুড়বাগান স্ট্রীট। না?

—হ্যাঁ।

—কত নম্বর?

নম্বর বলে তারাপদ।

শংকর উঠে দাঁড়ায়। বলে—যদি যাই কোলকাতায়, তবে দেখা করবো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। যদি যাই বলছেন কেন? নিশ্চয় যাবেন। আপনি ওর বন্ধু। আপনার তো যাবার অধিকার আছেই।

শংকর চলে যায়। মনে মনে ভাবে—সরোজিনীর বর যতটা অসভ্য হবে বলে দেখা করতে গিয়েছিল ততটা অসভ্য তো নয়। বরং লেখাপড়া যেন একটু বেশীই জানে মনে হলো। চলে এসে ভালই করেছে। কী জানি কী জিগ্যেস করতে কী জিগ্যেস করবে।

রাত্রে সরোজিনীকে তারাপদ বললো—তোমার বন্ধু এসেছিলেন দেখা করতে।

—আমার বন্ধু আবার কাকে পেল্য়্যা?

—বাঃ! শংকর না কী যেন নাম।

—শংকর? উ তো পাগল!

—পাগল মানে?

—পাগল মানে আবার কী? পাগল মানে পাগল।

—কিন্তু আমার তো পাগল বলে মনে হলো না ভদ্রলোককে। আমার সঙ্গে তো বেশ ভালভাবেই কথাবার্তা বললেন।

—ওই তোমার সঙ্গেই ভাল কর্য়্যা কথা বললে, কিন্তু আমার সঙ্গে কিছু বুললেই বলে—আমার সঙ্গে পালিয়ে চল্। বুঝ্ল্যা?

হাসলো তারাপদ। কিন্তু কিছু বললো না। সে জানে তার স্ত্রী খুব রূপসী নয়। কিন্তু অসাধারণ যৌবনবতী। এমন যৌবনের সমারোহ চট্ করে কোন মেয়ের দেহে দেখা যায় না।

ননীর মা যথাসম্ভব যত্ন করতে লাগলো জামায়ের। হরিশ কোন কথাই বলে না তার সঙ্গে। গিরীশ, ননীও তাই। কিন্তু দুই বৌ খুব মেলামেশা আদরযত্ন করে।

ননীর মা হরিশকে বলে—জামাইকে তো শুধাবা?

—কী শুধাবো ?

—কেমন আছে না আছে ?

—ভাল যে আছে, সে তো দেখতেই পেছি। ও আবার শুধাবো কী ?

—ভাল মরদ বটে তুমি !

—তুই লক্ কোর্য়্যা থাকধিনি নোন্য়্যার মা। তুই ক্যানে সব কথায় কথা বলিস। কী হোছে না হোছে সবই আমি দেখতে পেছি।

ননীর মা আর কিছু বলেনি। চিরদিনের কাঠগোঁয়ার হরিশ মিস্ত্রী। কী বলতে কী বলে ফেলবে—তখন নতুন জামাই—। না না বাবা, তার চাইতে কারখানায় বসে পেহা বানাক—সে বরং ভাল।

মাঝে একদিন প্রাণকুমার গোস্বামীর বাড়িতে কৃষ্ণলীলা কীর্তন হলো। ময়নাডাল থেকে গাইয়ে এসেছে। পাড়ার সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হলো। মেয়েদের বসবার জায়গা আলাদা। চিকের আড়ালে। পুরুষরা সামনে। তারাপদও এসেছে। তাকে বেশ খাতির করেই বসিয়েছেন প্রাণকুমার। এই দেখে সমাজপতি-স্থানীয় দু'চারজন মানুষ অসুস্থতার অজুহাতে উঠে চলে গেলেন।

গান যখন জমে উঠেছে তখন সরোজিনীকে একটি ছেলে এসে ডাকলো। বললো—বাইরে একজন ডাকছে আপনাকে।

সরোজিনী বেরিয়ে এসে দেখলো অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পতার মা। পতার মার চরিত্র সম্বন্ধে নতুনগঞ্জে সুনাম নেই। যৌবনকালে মানুষটি নাকি অনেক লোককে জ্বালিয়েছে। এখন বৃদ্ধবয়সে দূতীগিরি করে, অবশ্য গোপনে।

—পিসী, তুমি আমাকে ডাকছিল্য়্যা? সরোজিনী জিগ্যেস করলো।

—হ্যাঁ। দাঁড়া না ক্যানে। বলছি।

—কী গো! কী বুলছো?

—বুলছি—তুই এতো বোকা ক্যানে? গোঁসাইজীর ভাল লেগেছে তোকে। রেতের ব্যালা আসবি, ঘণ্টাখানেক থাকবি—ব্যস্! তাছাড়া বোল্য়্যাছে যে একশোটা টাকাও দিবে তোকে।

—বুলছো কি পিসী? অবাক হবার ভান করে সরোজিনী।—একশো টাকা দিবে দাদাঠাকুর?

—হ্যাঁ দিবে। "পীরিতে মজিলে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" না হেলে—তুই ছোটজাতের মেয়্যা, তোকেই বা ক্যানে ভাল লেগে যাবে গোঁসাইজীর!

—হুঁ। তাইতো দেখছি। একশো টাকাটাও তো কম লয় পিসী!

—লয়ই তো! তুই যাবি কবে?

—চার পাঁচ দিন পরে।

—ভেবে মন যদি ঠিক হয়, কাল রেতেই চোল্য়্যা আসিস। এক ঘণ্টা ছু' ঘণ্টা থেক্য়্যা চোল্য়্যা যাবি। যা এখন গান শুন্গা যা।

সরোজিনী কিছু বললো না। ধীরে ধীরে একপা একপা করে নাটমন্দিরে গিয়ে ঢুকে মায়ের পাশে বসে গান শুনতে লাগলো।

গান ভাঙলো অনেক রাত্রে।

পরদিনই তারাপদ সরোজিনীকে নিয়ে ছুপুরের গাড়িতে রওনা হলো।

দুজন লোক নিজের নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই যাওয়াটা দেখলো নিঃশব্দে। একজন প্রাণকুমার, আর একজন শংকর। বিকেলেই দেখা হলো পতার মার সঙ্গে। নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণকুমার বললেন—বুঝলে মোক্ষদা, ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দিয়ে, ব্রাহ্মণকে উপবাসী রেখে চলে গেল সরোজিনী। এর জন্যে নিঃশ্বাস পড়লো আমার। ভাল হবে না ওর। দাম্পত্যসুখ জীবনে পাবে না সরোজিনী। গোবিন্দ হে!

॥ আট ॥

এর মধ্যে আর কোন ঘটনা ঘটেনি।

প্রায় চার বছর কেটে গেছে।

হরিশের কারবার আরো বড় হয়েছে।

ননীর দুটি সন্তান হয়েছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

গিরীশের বৌ এখানেই থাকে, কিন্তু তার বাচ্চাকাচ্চা হয়নি।

শংকর বিয়ে করেছে। প্রাণকুমার দেহ রেখেছেন। তাঁর পোষ্যপুত্র শ্রীগোপাল এখন গোবিন্দের সেবাইত।

সুহাস এম-এ পড়তে কোলকাতায় চলে গেছে।

সরোজিনী মাঝে একবার ননীর ছেলের ভাতে নতুনগঞ্জে এসেছিল, দু'দিন থেকে চলে গেছে। তারও কোন বাচ্চাকাচ্চা হয়নি।

তারাপদ এম-এ পাস করে প্রফেসারী করছে।

কিন্তু সবচাইতে উন্নতি হয়েছে সরোজিনীর। তার কথাবার্তা একদম শুধরে গেছে। সে এখন পরিষ্কার কোলকাতার কথা বলতে পারে। দেখতে সে আরো সুন্দরী হয়েছে। তারাপদর অধ্যাপক বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করে বলে—তোমার স্ত্রী নিশ্চয় আগে গ্রীস দেশের মেয়ে ছিল। এমন দেহসৌষ্ঠব বাঙালীর পরিবারে চোখে পড়ে না।

সেদিন গরম একটু বেশীই পড়েছিল।

কিষ্টপুরের অনেকগুলি গাড়োয়ান দুপুরবেলায় হরিশের

কারখানার আটচালাটার মধ্যে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল—লরী বলে একরকম গাড়ি নাকি কোলকাতায় চলছে—তাতে গরু ঘোড়া কিছু লাগে না। আপনি চলে। সত্যি যদি ওইসব জিনিস এসে পড়ে এদিকে, তাহলে কী উপায় হবে তাদের ?

হরিশের কানে গেল কথাটা। সে উঠে বসলো। বললো —কী বুলছো গো তোমরা ? কী এস্য়্যাছে কোলকাতায় ?

—সে একরকম গাড়ী গো মিস্তিরী। উয়াতে গরু ঘোড়া লাগে না। মটর গাড়ী দেখেছ তো ?

—আমাদের ইখানকার ছোটকুঠির বাবু যা চড়ে যায় ?

—হ্যাঁ, উয়াই। তবে আরো বড়। হাজার হাজার মণ বোঝা লিয়ে নাকি আপনি ছুট্য়্যা যায়। একটা লোক শুধু চালায়।

বিশ্বাস করতে পারে না হরিশ। এ হতে পারে না। কখনই হতে পারে না। তবু বলে—কতি শুন্ল্যা ইসব কথা ?

—বাবুরা বলাবলি করছিল—তাই শুন্ল্যাম।

—কী বুলছিল বাবুরা ?

—বুলছিল—গরু পাল্তে অনেক খরচ। উয়াই একখান আনিয়ে লিলে হয়।

—তাহেলে গরুগুল্যা কতি যাবে ?

—কে জানে মিস্তিরী! আজকাল কতো রকমই তো হোছে। ইয়াও হয়তো হবে।

বিশ্বাস করলো না হরিশ। বললো—কী নাম সে গাড়ীর ?

—লরী—না কী জানি। জবাব দিল একজন।

—না। মিথ্যা কথা।

বললো বটে মুখে, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল হাতের কাজ সারা হচ্ছে না তার। একটা চাকা তৈরি করতে অনেক

সময় লাগে। কাজ করে আর পথের দিকে চেয়ে থাকে। কে জানে, হয়তো কাল বা পরশু কি তার পরদিন ওই বড় সড়ক দিয়ে সেই সর্বনাশা লরী আসবে।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে সরোজিনী। অনেকের মুখে এই ইংরেজী ছবির সুখ্যাতি শুনে শুনে সে স্বামীকে একদিন বলেছিল তাকে নিয়ে যেতে। তারাপদ ওসব ভালবাসে না। সে সারাদিন টিউশনি করে, কলেজে পড়ায়। রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে খাওয়াদাওয়ার পর বই নিয়ে বসে, কখনো বা পরীক্ষার খাতা দেখে, অনেক রাত্রে ঘুম পেলে যখন শুতে যায় তখন সরোজিনী ঘুমে কাতর। তাকে আর জাগায় না তারাপদ, নিঃশব্দে পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

রোজ রোজ বলতে বলতে একদিন কেঁদে ফেললো সরোজিনী।

তারাপদ আর কোন দ্বিরুক্তি না করে বললো—রবিবার যাবো।

ইংরেজী ছবি। তখনো ছবি কথা কয়নি। কিন্তু বিখ্যাত ছবি বলে অনেকদিন ধরে চলছে।

অন্ধকারের মধ্যে ছবি চলছে। উত্তেজনার পর উত্তেজনা। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সরোজিনী দেখছে। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যেই সরোজিনীর পাশ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ ভেসে এল প্রায় ফিসফিস করে।—কেমন আছ ?

পাশে চাইলো সরোজিনী। কিন্তু এত অন্ধকার যে কিছু দেখা গেলো না। স্বামী তার ডানপাশে, শব্দটা এসেছে বাঁ-পাশ

থেকে। ভয়ে তার সমস্ত শরীর ভারী হয়ে উঠলো। ছবি দেখা মাথায় উঠলো। কিন্তু স্বামীকে কিছু বলতে তার লজ্জা করতে লাগলো। হয়তো এমনও হতে পারে—কথাটা অন্য কেউ আর একজনকে বলেছে। অন্ধকার বলে তার মনে হয়েছে পাশ থেকে শব্দ এসেছে। সে ঠিক করলো, এবার যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তবে সে জবাব দেবে—যা থাকে কপালে।

ঠিক তাই হলো। পাশ থেকে আবার আওয়াজ এল—বললে না কেমন আছ?

শিরশির করে উঠলো সরোজিনীর শরীরের মধ্যে। তবু সে যথাসম্ভব নিজেকে সামলে ফিসফিস করে বললো—ভাল আছি।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

উৎকর্ণ হয়ে আছে সরোজিনী। একটু পরেই আবার শোনা গেল—নতুনগঞ্জে যাওনি এর মধ্যে?

—না।

—কতদিন যাওনি?

—প্রায় আড়াই বছর। কিন্তু—

কিন্তু বলা গেল না। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো সরোজিনী।

একটু পরেই ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠলো।

চট করে নিজের বাঁ-পাশে চাইলো। প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল সরোজিনী। তার পাশে বসে সিনেমা দেখছে সুহাস। সে সুহাসই নয়। এ সুহাসকে সে চেনে না। অপূর্ব রূপবান। এ সুহাসকে সে যেন কখনো দেখেনি।

আর সুহাস? তার অবস্থা আরো কাহিল। যে সরোজিনী তার পাশে বসে আছে, এ কি সেই সরোজিনী? তার সরো? এর

সঙ্গেই কি সে বিয়ের আগে গঙ্গার ধারে দেখা করতো? বোধহয় না। এ বোধহয় অন্য সরোজিনী। বর্ষার নদীর মতো দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছে এর যৌবনের নিস্তরঙ্গতা।

—তুমি! হেসে বললো সরোজিনী। বা-ব্বা! যা বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছিল।

—কেন? সুহাস বললো।

—কেন? এই অন্ধকারের মধ্যে থেকে যদি একটা আওয়াজ আসে—কেমন আছ, কী রকম লাগে?

—গলার আওয়াজেও চেনা গেল না?

—না না, তোমার গলার আওয়াজ একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। একটুও বুঝতে পারিনি।

—তোমার কথার মধ্যে নতুনগঞ্জের টান একদম নেই। আশ্চর্য তো! কই, তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও!

লজ্জায় জিভ্ কাটলো সরোজিনী। বললো—সত্যিই তো! একেবারে মনে নেই। এই বলে মুখ ঘুরিয়ে তারাপদকে বললো—ছাখো, তোমাকে যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু সুহাসের কথা বলেছিলাম, এ সেই সুহাস।

—নমস্কার! বললো তারাপদ।

—নমস্কার! জবাব দিল সুহাস।—সরো আর আমি, আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু। বয়সেও আমরা সামান্য ছোট বড়। আপনি তো স্কুলে মাস্টারি করেন, না?

—করতাম। এখন আর করি না। এখন কলেজে পড়াই।

—আচ্ছা! তবে তো খুব ভাল।

—আপনি?

—আমিও গেল বছর থেকে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ঠেঙাচ্ছি।

—তাহলে তো আমরা সতীর্থ? বললো তারাপদ।

—হ্যাঁ। এবং বন্ধু।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

উঠে দাঁড়ালো সুহাস। বললো—চলুন কিছু খেয়ে আসা যাক।

তারাপদ একটু কুণ্ঠা বোধ করলো। বললো—আমি তো চা খাই না।

—নাইবা খেলেন! খাবার খেতে আপত্তি কী?

—সে গুড়েও বালি। হেসে উঠলো সরোজিনী।—ও আবার মাছ-মাংস কিছু খায় না।

—সেকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি এক কাজ করুন। সরোজকে নিয়ে যান। খেয়ে আসুন। বললো তারাপদ।

—আরে দূর মশায়! তা কি হয়?

—কেন হবে না? আপনারা দুজনে বাল্যবন্ধু। কতদিন পরে দেখা হলো, যান যান! তুমি যাও ওঁর সঙ্গে, খেয়ে-দেয়ে এস। আমি বলছি তুমি যাও।

—তাহলে চলো। বললো সরোজিনী।

দুজনে চলে গেল।

তারাপদ আবার নিজের চিন্তায় ডুবে গেল।

'প্যালেস অব ভ্যারাইটি' থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে একটা চমৎকার রেস্তোরাঁয় ঢুকলো সুহাস ও সরোজিনী। পাশাপাশি চারটি কেবিন। সব শেষেরটা খালি ছিল। সেখানে গিয়ে ঢুকে বসলো দুজনে। খাবারের অর্ডার দিল সুহাস।

—অদ্ভুত সুন্দর হয়েছো তুমি দেখতে। বললো সুহাস।

—তুমিও তো তাই। সরোজিনী জবাব দিল।

—অন্ধকারের মধ্যে তুমি কী করে বুঝলে যে ওটা আমি।

—তোমরা যখন ঢুকছিলে তখন আমি দূরে ছিলাম। টিকিটও পেলাম তোমাদের পরেই।

দুজনেই চুপ করে গেল।

কথা তো অনেক আছে—শোনবার, শোনাবার। কিন্তু আরম্ভ কোত্থেকে করা যায়? ফলে অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলো না।

হঠাৎ সুহাস বললো—তুমি তো আচ্ছা মেয়ে—ঠিকানা পাঠাওনি কেন?

সরোজিনী কিছুক্ষণ সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো —কেন মিথ্যে কথা বলছো? ঠিকানা তোমাকে নিশ্চয় পাঠিয়েছি। হারিয়ে ফেলেছো—সেটা বলছো না কেন?

হেসে ফেললো সুহাস। বললো—সত্যি হারিয়ে ফেলেছি সেটা। তবে বাদুড়বাগান স্ট্রীটটা মনে আছে। সেই ঠিকানাই আছে তো?

—হ্যাঁ। ওখান থেকে ওঁর কলেজটা খুব কাছে তো।

—কত নম্বর যেন?

—চারের-একের-দুয়ের বি।

খাবার এসে গেল। খেতে আরম্ভ করলো দুজনে।

সুহাস বললো—আমার বাসা কোথায় জান?

—কোথায়?

—চারের-একের-দুয়ের তিন বাদুড়বাগান স্ট্রীট।

—আরে! চেঁচিয়ে উঠলো সরোজিনী।—তার মানে ওই ছোট ছোট একতলা নতুন ফ্ল্যাটগুলো? শুনেছি দুখানা ক'রে ঘর—

—হ্যাঁ। ওরই সামনের বাড়িটাতে।

—তার মানে আমাদের পাশের বাড়ির পাশের বাড়ি। আচ্ছা—তুমি কী? কতদিন আছো ওখানে?

—প্রায় দেড় বছর।

—ছি ছি ছি! না, তোমাকে কিছু বলার নেই আমার। একই রাস্তায় প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে বাস করছো, অথচ তুমি আসোনি, খোঁজও করোনি। এই বলে একটু থেমে বললো—বুঝেছি।

—কী বুঝেছ?

—বিয়ে করেছ বলে সাহস হয়নি আসতে।

—খুব খুশী হতাম তোমার অনুমানটা সত্যি হলে। কিন্তু ও কাজটা হয়নি এখনো। বাবা অবিশ্যি মাঝে মাঝে চিঠি দেন—অমুকের মেয়ে, তমুকের ভাগ্নী—তোমার মত পাইলে কথা দিতে পারি। কিন্তু মত দেওয়া কি এতই সহজ?

—কেন?

—না।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। চা দিয়ে গেল বয়। দুজনের মধ্যে আর কোন কথা হলো না। চা খাওয়াও একসময় শেষ হলো। সুহাস একটা দশ টাকার নোট বয়কে দিল। সে চেঞ্জ আনবার জন্য চলে গেল। ডিস থেকে দুটো মৌরি তুলে মুখে দিয়ে সুহাস বললো—বিয়ের আগে গঙ্গার ধারে দেখা হওয়ার কথা মনে আছে?

লাল হয়ে উঠলো সরোজিনীর গাল দুটো। সে চোখ দুটো টেবিলে রেখে সামান্য হেসে বললো—মনে আছে বৈকি! সেটা কি ভুলে যাবার মতো কথা? তুমি ভুলতে পারো, আমি পারি না।

—চলো। ছবি বোধহয় আরম্ভ হয়ে গেছে।

—হোক্‌গে। বলে সরোজিনীও উঠলো।

আবার রাস্তা পার হয়ে দুজনে সিনেমা হাউসের কাছে এলো। ভেতরে ঢুকে দেখল ছবি অনেকক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। স্ত্রী এসে বসেছে দেখে তারাপদ বললো—খুব খাচ্ছিলে বুঝি?

লজ্জা পেল সরোজিনী। বললো—হ্যাঁ, সে অনেক খাবার। অনেক দিন পরে দেখা। একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। রান্নাও শিখেছি ওরই মায়ের কাছে। বাইরে থেকে এসে কেউ আমাদের দুটো বাড়িকে বামুন-শূদ্দুরের বাড়ি বলে মনে করতো না। ভাবতো, একই বাড়ি। ও থাকে কোথায় জান তো?

—কোথায়? ছবির দিকে চোখ রেখে বললো তারাপদ।

—আমাদের বাড়ির পাশে যে ছোট ছোট একতলা বাড়িগুলো তৈরী হয়েছে তারই একটায়।

—ভালোই হলো। তোমাকে আর একা থাকতে হবে না।

—হ্যাঁ।

আবার ছবি দেখতে লাগলো সরোজিনী। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে সে সুহাসের হাত ধরলো। তারপর ধরেই রইলো।

॥ নয় ॥

যে ভয়ে হরিশের দিনের কাজ আর রাতের ঘুম বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল, যে সম্ভাবনার কথা ভেবে সে খেতে পারছিল না, সেই আশঙ্কা অবশেষে সত্যে পরিণত হলো।

সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কারখানার আটচালায় বসে বসে ঝিমুচ্ছিল।

শ্রাবণ মাস। থেকে থেকে আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি নামছে। জলে একেবারে থই-থই করছে চারদিক।

এখান থেকে সোজা লালগোলা যাবার পথটায় এত কাদা যে তা ঠেলে গরুর গাড়ি আসা কষ্টকর। আজ পাঁচদিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। কাজকর্ম সব বন্ধ।

হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল হরিশের। চেয়ে দেখলো একটা বিচিত্র ধরনের গাড়ি কাদা ঠেঙিয়ে সোজা চলে আসছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো হরিশ। চোখ পড়লো চাকার দিকে। চারটি বিরাট বিরাট চাকা লাগানো গাড়িটাতে। দিব্যি চলে আসছে কাদার মধ্যে দিয়ে।

কারখানার সামনে গাড়ি থামলো। ড্রাইভার নেমে এসে বললো—এক ছিলিম দিব্য়্যা নাকি মিস্তিরী? হবে?

—হবে না ক্যানে? এসো।

ড্রাইভার ও তার অ্যাসিস্ট্যান্ট গাড়ি থেকে নেমে এলো হরিশের আটচালায়।

হরিশ হুঁকো থেকে কল্কেটা তুলে ওদের হাতে দিল। কল্কে হাতে রেখে জোরে জোরে টান দিতে লাগল ড্রাইভার।

—কুন্খান্ থেক্য়্যা আস্ছো ?

—আসছি মাশায় ভাব্তা থেক্য়্যা।

—যাবা কতি ?

—যাবো ভগবানগোলা। কাঠ লিতে। তা'পর্ কাঠ লিয়ে যাবো বেলডাঙ্গায় শরীফ মিঞার বাড়ি। উয়ার ব্যবসা আছে কাঠের।

—এই গাড়ী কার ? গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করে হরিশ।

—গাড়ি হোছে বহরমপুরের মল্লিকবাবুদের। দুখ্যান কিন্য়্যাছে। খাটতে খাটতে জান হালাকান হয়ে গেল মিস্তিরী !

—ই গাড়ীর কিসের চাকা ?

—চাকা হোছে রবাটের।

—রবাটের চাকা !

—হ্যাঁ, রবাটের।

আরো কিছুক্ষণ বসে গল্পটল্প করে ড্রাইভার ও তার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চলে গেল।

সেই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল হরিশ মিস্ত্রী। মনে মনে বললো—এবার সব মোলো। গরু মোলো, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান মোলো, আমরা মোল্য়্যাম্—সাফা হয়ে যাবো। জীয়ন্ত মানুষ, জীয়ন্ত গরু, জীয়ন্ত গাড়োয়ান—গাড়ী চালিয়ে পেটের ভাতের যোগাড় করছিল, হয়ে গেল। লে মজা ! কলের গাড়ী এস্য়্যা সব হাগুল-পাগুল কোর্য়্যা দিলো। হরিবোল হরিবোল হরিবোল···

সামনের দিগন্তবিস্তৃত মাঠটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ জ্বালা করে হরিশের। জল আসে চোখে। অনেকক্ষণ থেকেই আকাশ কালো করে মেঘ জমছিল, এবার বৃষ্টি নামলো। হরিশ চেয়েই রইলো সামনে। কেমন যেন একটা বোবা কান্না ঘুরপাক

খায় বুকের মধ্যে। চার পুরুষের পেহার কাজ এবার থেমে যাবে। ছেলেরা বড় হয়েছে—রেল লাইনে মাটি কেটেও সংসার চালাতে পারবে।

গিরীশ এখানে থাকে না। খাগড়ায় শ্বশুরের কাছে হাতীর দাঁতের কাজ শেখে।

শশিমুখী এখানেই থাকে, কিন্তু তার মুখের জ্বালায় টিকতে না পেরে ননীর মা একদিন স্বামীর কাছে নালিশ করে বড়বৌকে আলাদা করে দেবার জন্য।

সব কথা চুপ করে শোনে হরিশ। তারপর বড়বৌকে ডেকে জিগ্যেস করে—তুমি আলাদা থাক্‌ব্যা ?

—হ্যাঁ।

—একলা থাকতে পারব্যা ?

—ক্যানে পারবো না।

—ঠিক আছে। উয়াই কোর‍্য়্যা দিচ্ছি তোমাকে। কিন্তুক্ তুমি আর জ্বালিয়ো না। এখন সময়কাল কেমশই খারাপ হোছে। ই সময়ে বাড়িতে দিনরাত কাজিয়া লেগ্য়্যা থাকলে মাথার ঠিক থাকবে না। কুন্‌দিন ফসাম্ কোর‍্য়্যা হেস্য়্যার বাড়ি বসিয়ে দিব গলায়! পরের মেয়্যা। ঠিক আছে, থাকোগা আলাদা ঘরে।

পরের দিনই মিস্ত্রী লাগিয়ে বাড়ির পেছনের জায়গাটাতে এক-খানা খড়ের ঘর তুলে দিল হরিশ। দিন পাঁচ ছয় লাগলো ঘরটাকে বাসযোগ্য করে তুলতে।

ছোটছেলেকে ডেকে বললো—গির্‌শ্যাকে একখানি চিঠি লেখে দে তো বেটা যে উয়ার বৌকে আমরা আলাদা কোর‍্য়্যা

দিয়্যাছি। টাকা যা পাঠাবার তা য্যানে বৌয়ের নামেই পাঠায়।

নিজের সবকিছু গুছিয়ে রেখেছিল শশিমুখী। ঘর শেষ হলে নিজেই দুম-দুম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠলো।

শাশুড়ী দু'বেলা খবর নেয়। ঘাটে যাবার সময় অমিয়া জাকে ডেকে নেয়। ভাল তরকারী রান্না হলে বড়বৌকে দিয়ে আসে ননীর মা।

শশিমুখী সরে যাওয়াতে একটা জিনিস হলো যে বাড়ির মধ্যে যে চব্বিশ ঘণ্টা একটা চীৎকার চলতো, সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

সেদিন শনিবার।

বেলা তিনটার পর গোপী পিওন একখানা চিঠি দিয়ে গেল। বেচারা বেলা দশটায় বেরিয়ে সাত রাজ্য ঘুরে পাড়ায় পাড়ায় চিঠি বিলি করে শেষ চিঠি এখানে দিয়ে পোস্ট অফিসে ফিরে গেল।

খামের চিঠি।

ননীর মা চিঠিখানা হাতে করে ছোটছেলে দুলালের কাছে গেল। সে তখন বেড়াতে যাবে বলে চুল আঁচড়াচ্ছিল।

মা গিয়ে বললো—দুলা বেটা! তোর দিদি কী লিখ্যাছে একটু পড়্যা দেনা বেটা।

—আমার সময় নাই। ছোটবৌদিকে দিয়ে পড়িয়ে ল্যাও। এই বলে দুলাল শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

অমিয়া তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। শাশুড়ীর কাছে এসে বললো—দ্যান, আমি পোঢ়্য়্যা দিছি।

—পড়ো তো মা। কী লিখ্য়্যাছে বিটি ?

পড়তে লাগলো অমিয়া :

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মা, তুমি এই পত্রে আমার ও তোমার জামাইয়ের প্রণাম নিও। আমরা ভাল আছি। তুমি ও তোমরা সবাই কেমন আছ লিখিবে। তুলাল যদি চিঠি না লিখে, তুমি ছোটবৌদিদিকে দিয়া লিখাইও। এখানে আমাদের পাশের বাড়িটা ভাড়া লইয়াছে সুহাসদাদা। সে রোজই আমাদের বাড়িতে আসে। খায়-দায় —অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প করে। বাবার শরীর কেমন আছে জানাইবে। অধিক আর কী লিখিব। তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার জামাইয়ের তো ছুটি নাই যে তু'দিন গিয়া বেড়াইয়া আসিব। দাদা খাগড়া হইতে আসিয়াছিল কি ? তুলাল পড়াশুনা কেমন করিতেছে ? ছোড়দা কেমন আছে ? ইতি—

তোমার স্নেহের সরো।

—ঠাকুরঝির হাতের ল্যাখাটাও কত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ। হাসিমুখে বললো ননীর মা।—লক্ষ্মী মা আমার, এক-খানা পোস্টোকার্ট্ লিয়্যা জবাবটা লেখ্যা দিও।

—আচ্ছা। বললো অমিয়া।

তুলাল এনট্রান্স পরীক্ষা দিল, এবং ভালভাবেই পাস করলো। হরিশ এই উপলক্ষে তার আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ খাওয়ালো। সবাই খুব আনন্দ প্রকাশ করলো তুলালের সাফল্যে।

সেই রাত্রে ছেলেকে কাছে ডেকে তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বললো হরিশ—বেটা তুলো! ল্যাখাপড়া তো বহুৎ দূর

শিখ্য়্যা লিল্য়্যা বেটা। এবার ল্যাও একটা ব্যবসা লিয়ে ইখানে—

—আপনি কি ক্ষেপ্যাছেন না পাগল হোয়্যাছেন? আমি কলেজে পড়বো।

কিছুক্ষণ ছেলের দিকে চেয়ে থেকে বললো হরিশ—সে তো অনেক খরচার ব্যাপার বেটা।

—আপনার খরচ হবে বোল্য়্যা আমি ল্যাখাপড়া শিখবো না?

—শিখবিন্য়্যা ক্যানে? শিখা তো হলো।

—না, কিছুই হয়নি। আমি কলেজে পড়বো। না হলে আমি হাতীর দাঁতে যন্তর ঘষতে পারবো না আর আপনার মতো পেহাও বানাবো না। ল্যাখাপড়া শিখ্য়্যা আমি চাকরি করবো।

অগত্যা—নিরুপায়—পাড়ার শিক্ষিত লোকজনকে ধরে তাদের বলে-কয়ে বহরমপুর কলেজে তুলালকে ফার্স্ট ইয়ার আর্টসে ভর্তি করে দিয়ে এলো। নতুনগঞ্জ থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করা সম্ভব নয় বলে হোস্টেলের ব্যবস্থাও হলো।

কলেজ-জীবন আরম্ভ হবার তু'মাসের মধ্যে তুলাল সিগারেট খেতে শিখলো। হাওয়াগাড়ি সিগারেটের প্যাকেট সর্বদা তার পকেটে।

বহরমপুরের বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে হয়, তাদের সঙ্গে হোস্টেলে থাকতে হয়, সেই পরিমাণে কাপড়-জামার দরকার। তিনখানা চিঠি লিখেও বাপের কাছ থেকে ন্যায্য টাকার চাইতে এক পয়সাও বেশী গেল না দেখে রাগের চোটে তুলালের কালো চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করলো। সে কাউকে কোন কথা

না বলে সন্ধ্যার গাড়িতে নতুনগঞ্জে এসে নামলো। হরিশ বাড়িতে ছিল না, বাজারে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে খুব অবাক হলো হরিশ। বাজারটা রান্নাঘরের দাওয়াতে নামিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো—কী ব্যাপার নোন্‌য়্যার মা? ছেল্‌য়্যা চোল্‌য়্যা এলো ক্যানে?

—তুমি টাকা পাঠাছো না— কিছু না।

—টাকা পাঠাছিন্‌য়্যা?

—হ্যাঁ। ইস্‌কুলের মাহিন্‌য়্যা আর থাকার জন্যে যা পাঠাও তাতে উয়ার চলে না। কাপুড়-জামা ভাল পরতে হয়। একটা দোকানে জামা আর কোট বানাতে দিয়েছিল—উয়াতে তিন কুড়ি দশ টাকা লাগবে। সেই টাকা লিতে এস্‌য়্যাছে।

হাঁ করে থেকে কিছুক্ষণ পরে হরিশ বললো—তিন কুড়ি দশ টাকা! কতি পাব?

—সে আমি জানিন্‌য়্যা। তুমি ছেল্‌য়্যার সঙ্গে কথা বোলো না ক্যানে?

কথা বললোও কিছুক্ষণ হরিশ দুলালের সঙ্গে।

কিন্তু বহরমপুরে গিয়ে দুলাল একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। কথাবার্তা বলে রসকসহীন,—উদ্ধত ভঙ্গী।

ফস্‌ করে বলে বসলো—আপনি মুখ্যু। আপনাকে কী কোর্‌য়্যা বুঝাবো যে শহরে থাকতে গেলে কী কী খরচ লাগে। ক্যামুন কাপুড়-চুপড় পরতে হয়। টাকা না লিয়্যা আমি যাবো না।

—কিন্তু টাকা কতি পাব?

—সে আমি জানিন্‌য়্যা। টাকা দিতে হবে। না দিলে বন্ধুদের কাছে আমি বেইজ্জত হবো। রেললাইনে গলা দিয়ে দিব।

চুপ করে ছেলের দিকে চেয়ে আছে হরিশ। তার মনে হলো এ কি সেই দুলাল, যাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে সে গোটা সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল? কেন করেছিল? এ কী হলো? লেখাপড়া তো তার জামাই তারাপদও করেছে। কতো বেশী লেখাপড়া! কিন্তু দুলাল যদি এরই মধ্যে এরকম করে তাহলে দুটো পাসের পর সে কী করবে?

কিছু জমা টাকা ছিল হরিশের, তার থেকেই দুলালকে সত্তর টাকা দিয়ে দিল।

পুরো দু'মাসও গেল না। দুলাল আবার বাড়ি এল। কলেজ থেকে সবাই পুরী যাবে, তাকেও যেতে হবে, একশো টাকা চাই।

হরিশ কোন কথা না বলে টাকা বার করে দিল।

দুলাল চলে গেল।

আরো তিন মাস পরে।

একখানি চিঠি এল হরিশচন্দ্র ভাস্করের নামে। তাতে লেখা আছে—আপনার পুত্র শ্রীদুলালচন্দ্র ভাস্কর আজ তিন মাস হোস্টেল চার্জ দেয় নাই। সে এই বিষয়ে আপনাকে লিখিতে বলায় আপনাকে জানানো হইতেছে। পত্রপাঠ তিন মাসের হোস্টেল চার্জ পাঠাইয়া দিবেন।

তলায় হোস্টেল সুপারিনটেনডেণ্টের স্বাক্ষর।

—নোন্‌য়্যা!

—কী বুলছো?

—আমাকে একবার বহরমপুর নিয়ে চল্ তো বেটা।

—ক্যানে ?

—দুলালবাবুর টাকাটা দিয়ে আসবো।

অগত্যা ননী রাজী হলো।

ননীর মা দু'একবার বলবার চেষ্টা করলো যে টাকাটা ননীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু স্বামীর মুখ দেখে আর কিছু বলতে সাহস করল না।

পরদিন ভোর ছটার গাড়িতে হরিশ ননীকে নিয়ে বহরমপুর রওনা হলো।

॥ দশ ॥

খবরটা আগে জানতে পারলে দুলাল নিশ্চয় সরে থাকতো। কিন্তু সে সুযোগ পেলো না।

সাড়ে সাতটার মধ্যে হরিশ যখন হোস্টেলে পৌঁছলো, দুলাল তখন দোতলার বারান্দায় বসে টোস্ট আর ডিম খাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে হরিশ উঠে এসে দুলালকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে এমন একটি চড় মারলো যে দুলাল ঘুরে মেঝেয় পড়ে গেল। সেখান থেকে তাকে টেনে তুলে পর-পর এমনই চড় মারলো হরিশ, যার ফলে দুলালের সামনের দুটি দাঁত ভেঙে গিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখে তাকে মেঝেতে ফেলে দিল হরিশ। তারপর দুলালের হতবাক বন্ধুবান্ধবদের পাশ দিয়ে ননীকে নিয়ে নীচে নেমে এসে হোস্টেল-সুপারের ঘরে ঢুকে তিন মাসের টাকা মিটিয়ে দিয়ে আবার বহরমপুর স্টেশনে ফিরে গেল। এর মধ্যে একটা কথাও সে বলেনি।

সাত দিন পরে খবর এল দুলাল কাউকে কিছু না বলে হোস্টেল থেকে চলে গেছে।

হরিশ চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললো। বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে আপনমনে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রইলো।

শীতকালের মধ্যে আরো লরী এসে পৌঁছলো। গরুর গাড়ির কদর আরো কমতে লাগলো। যেখানে আগে রোজ দু' জোড়া

তিন জোড়া চাকা বিক্রী হতো, এখন সেখানে দশ পনেরো দিন অন্তর এক জোড়া বিক্রী হয়।

হরিশ মনে মনে ভয়ে কাঁপছে। অনেকগুলো টাকা দুলালের জন্যে নষ্ট হয়েছে। সংসার কী করে চলবে কে জানে!

মনে মনে ভগবানকে ডাকে হরিশ। বলে, শেষ বয়সে আর এমন কষ্ট দিও না ঠাকুর। লরীগুলোকে পথের মধ্যে খারাপ করে দাও।

অনেকদিন পেহা বানাতে বানাতে কাজ ভুলে সামনের মাঠের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে হরিশ। আবার এক একদিন দেখা যায়, কোন কাজ না করে বসে বসে কেবল তামাকই টেনে যায়। খদ্দের এসে ডেকেও কোন সাড়া পায় না। পাঁচ সাতবার ডাকার পর তখন যেন তার চেতনা ফিরে আসে।

সেদিন রাত্রে বসে এইসব পাঁচ-সাত ভাবছিল হরিশ।

রাত বারোটা বেজে গেছে।

চারদিক নিঃঝুম।

সংসারের কাজকর্ম সেরে ঘরে ঢুকলো ননীর মা। স্বামীর কাছে গিয়ে বললো—ঘুমিয়ে পোড়্য়্যাছো?

—না। ক্যানে? জবাব দেয় হরিশ।

—একবার উঠো তো।

—ক্যানে? ক্যানে? উঠবো ক্যানে?

উত্তেজিত গলায় বললো ননীর মা—আমার মনে হোচে বড়-বৌমার ঘরে কোন লোক ঢুক্য়্যাছে।

তড়াক করে উঠে বসে বোকার মতো নিষ্ক্রিয় চোখে চেয়ে রইলো স্ত্রীর দিকে হরিশ।

—ই কথার মানে ?

—কী জানি ! আমি গেঢ়্যার ধারে গিয়্যাছিল্য়্যাম এঁঠো ফেলতে। আসবার সময় আমার যেন মনে হলো বড়বৌয়ের ঘরের মধ্যে হাসাহাসি হোছে, ফিসফিস কথা হোছে।

ঘরের কোণা থেকে লাঠিগাছটা নিয়ে বেরোলো হরিশ।

শশিমুখীর নতুন ঘরের দাওয়ার ওপর উঠে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললো—বড়বৌ, দুয়ারটা একবার খুলো তো !

কোন সাড়া নেই।

আবার ডাকলো হরিশ—বড়বৌমা, দুয়ারটা খুলো।

সাড়া নেই এবারেও।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল এবং ছুটে কে একজন বেরিয়ে এসে হরিশকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে দাওয়া থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ে ছুটে পালালো।

হরিশ দেখেছে। এরই মধ্যে হরিশ তাকে দেখে নিয়েছে। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে চাইলো, তখনো শশিমুখী উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়চোপড় সামলাচ্ছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো হরিশ—কাল্ক্যা ভোরে জিনিসপত্তর গুছিয়ে লিবা খাগড়ায় রেখে আসবো তুমাকে।

বললো বটে, কিন্তু যার শোনার কথা, সে শুনলো বলে মনে হলো না। তক্তাপোষের পায়ার দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো ফোঁস ফোঁস করে।

হরিশ ফিরে এসে বললো স্ত্রীকে—ঘরের মধ্যে প্রাণকুমার গোঁসাইয়ের পুষ্যিপুত্তুর শ্রীগোপাল ছিল। আমি চাম চোখে স্পষ্ট

দেখ্য়্যাছি। খুব জোরে সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বেরহিয়ে গেল। উয়ারই মধ্যে আমি দেখ্য়্যা লিয়্যাছি। আমি এখন কী করবো বোলোধিনি? বৌটাকে খুন কোর্য়্যা ফাঁসি যাবো, না ওই শালা বাম্‌নাকে মের্য়্যা নিজে খুন হবো। কী করবো বল্ তো নোন্য়্যার মা?

—কিছুই করতে হবে না। তুমি লক্ কোর্য়্যা থাকো।

—ক্যামুন কোর্য়্যা লক্ কোর্য়্যা থাকবো? বুকের ভিতর জ্বলে যেছে আমার।

স্বামীকে ঘরে বসিয়ে আস্তে আস্তে শশিমুখীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো ননীর মা।

তক্তাপোষের ওপর বসে আছে শশিমুখী। মাথা নীচু করলো শাশুড়ীকে দেখে।

চাপা গলায় গর্জন করে উঠলো ননীর মা—কালামুখী, হারামজাদী, তুই মর্লিন্য়্যা ক্যানে? ইটা কী করলি তুই? এত জ্বালা তোর শরীলে?

হঠাৎ মাথা তুললো শশিমুখী। শাশুড়ীর মুখের ওপর চোখ রেখে বললো—ই সব বাহারের কথাবাত্রা তুমার বড় ব্যাটাকে বল্‌গা না? দুবেলা ছুট্য়্যা কোরয়্যা ভাত ফেলে দিয়ে গেলেই হল—না? আর কিছু চাহিন্য়্যা আমার? আমি বুঢ়্য়্যা হয়্যা গিয়্যাছি—না? আমার শরীলের আগুন সব লিভ্য়্যা গিয়্যাছে—না?

—তাই বোল্য়্যা তুই বাম্‌হুনের ছেল্য়্যার জাত মারলি?

—আমি উয়ার জাত মারিনি, ওই আমার জাত মের্য়্যাছে।

এই অবধি বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো শশিমুখী—বেশ ত কোর্য়্যাছি। আমার ইচ্ছ্যা হলে আবার করবো। বুঢ়য়্যাকে মানা

কোর্য়্যা দাওগা—আমি খাগড়া যাব না। এ লিয়্যা যদি চেঁচামেচি হয়, তেবে সকলের সামনে আমি বলবো—আগে তোমার ছেল্য়্যা ননী আমার ধম্মো নষ্ট কোর্য়্যাছে, তবে গোঁসাই এস্য়্যাছে।

ব্যস! এক চালে চুপ ননীর মা। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বৌয়ের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ননীর মা। মনে মনে বললো—না। কোন কথা বলা চলবে না। এইখানে আমাদের বুকের ওপর বসে ও বেশ্যাবৃত্তি করবে, অথচ একথা বলা যাবে না। কাউকে বলা যাবে না। ও কালনাগিনীর পক্ষে সব সম্ভব। হয়তো ননীর নামে যা-তা বলে দেবে। স্বামীকে যদি একথা বলে সে তবে হরিশ শশিমুখীকে নিশ্চিত খুন করবে। না, কাউকে বলবে না সে। কাউকে না।

॥ এগারো ॥

অত ভোরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সরোজিনী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েই চমকে গেল। দরজার বাইরে ময়লা জামা পরে হাতে স্যুটকেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুলাল।

—একি রে! তুই এত ভোরে কোত্থেকে এলি?

দুলাল কোন জবাব দিল না। চেয়ে রইল দিদির দিকে বোবার মতো।

—কী হয়েছে? অ্যাঁ! আয়, ভেতরে আয়। কী ব্যাপার রে? তোকে যে চেনাই যাচ্ছে না।

ভাইকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সরোজিনী স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিল। তারপর এক এক করে সব কথা শুনলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—এত টাকাই বা লাগলো কেন তোর? সিগারেট ধরেছিস বুঝি?

—কলেজে পড়লে সিগারেট খেতে হয়।

—কলেজে পড়িয়ে তোর বড়দা তো খায় না।

—উয়ার কথা বাদ দ্যাও। ভাল করে হাসতেই জানে না।

হাসলো সরোজিনী। তার পরেই এই ভাই। দুলাল তার অত্যন্ত আদরের।

—কাল বহরমপুর থেকে উঠেছিস?

—কাল উঠবো ক্যানে? আমি চার পাঁচ দিন আগে এস্যাছি কোলকাতায়।

—কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন?

—স্টেশনেই।

—সেকি রে দুলে!

—তা কী করবো? পড়ে পড়ে বাবার মার খেতে পারবো না। কী রকম মেরয়্যাছে দেখবা? এই গ্যাখ!

এই বলে দাঁত দেখালো দিদিকে দুলাল। সামনের দুটো দাঁত ভাঙা।

—থাক, আর তোকে নতুনগঞ্জে যেতে হবে না। আমার কাছেই থাক।

—সেই জন্যেই তো এল্‌য়্যাম।

কথাবার্তার আওয়াজে তারাপদর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে উঠে এসে দুলালকে দেখে বললো—শালাবাবু যে! কী ব্যাপার? কখন এলে?

—এইতো একটু আগে। বললো দুলাল।

—খবর সব ভাল?

—হ্যাঁ।

ভগ্নীপতির সঙ্গে দুলালের কথাবার্তার পালা এখানেই শেষ। কারণ তারাপদ কর্মব্যস্ত মানুষ। রবিবারেও তার টিউশনি থাকে। অতএব দুলাল তার দিদির কাছে রয়ে গেল। এবং মাসখানেকের মধ্যেই দেখা গেল বন্ধু-বান্ধবের পুরো একটি দল তাকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে। রোজই বেরুবার সময় এক টাকা দু' টাকা করে হাতখরচ নেয়। রেস্তোরাঁয় রোজই খায়। পাড়ার মধ্যেই একটা ভাল রেস্তোরাঁ আছে। বাকী দিনগুলোতে সিনেমা, চৌরঙ্গী ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এক একদিন বাড়ি ফিরতে রাত্রি এগারোটা সাড়ে-এগারোটা বেজে যায়। সরোজিনী একটু বকে। দুলাল চুপ করে থাকে। বোবার শত্রু নেই—একথা সে এরই মধ্যে শিখে নিয়েছে।

সেদিন সকালে দুলাল পাড়ার রেস্তোরাঁ 'জীবন জুড়ান'য় বসে চা টোস্ট খাচ্ছে, এমন সময় সুহাস ঢুকলো। তটস্থ হয়ে দুলাল বললো—ভাল আছেন সুহাসদাদা?

সুহাস সেই দিকে চেয়ে বললো—কে ভাই? আমি তো চিনতে পারছি না।

—আমি দুলাল।

—কে দুলাল?

—সরোর ভাই।

—সরোর—ওঃ! দুলো! বাব্বা! তুই যে রীতিমতো লায়েক হয়ে উঠেছিস রে! কবে এলি?

—মাসখানেক হবে।

—পড়াশুনা ছেড়েছিস—না, আছে এখনো?

—আছে।

—কী পড়ছিস?

—আই-এ। বহরমপুর কলেজে।

—তা এখন এলি। এক মাস আছিস বলছিস। কলেজে যাচ্ছিস না?

এমন বিপদে ফেলে এক একটা মানুষ। ঢোঁক গিলে বললো দুলাল—দিদি ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই—

—ও!

—দিদির সঙ্গে আপনার দেখা হয় না আর?

—উঁ? তোর দিদির সঙ্গে? না।

দুলাল আর সাহস করে কিছু বলতে পারলো না। যদি আবার লেখাপড়ার কথা জিগ্যেস করে বসে, তাহলেই চিত্তির। আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। উঠে পড়লো দুলাল।

পকেট থেকে পয়সা বার করতে যাচ্ছে দেখে সুহাস বললো-কী খেয়েছিস ?

—ছুটো টোস্ট, একটা পোচ, একটা চা।

—ঠিক আছে। নিবারণ, আমার নামে লিখে রাখো।

ছুলাল চলে গেল।

তার কাছে ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথা বললো সুহাস। সরোজিনীর সঙ্গে ও তারাপদর সঙ্গে আরো ছু'তিনদিন দেখা হয়েছিল। একদিন ওরা এসেছিল সুহাসের বাড়িতে। একদিন সুহাস গিয়েছিল। আর একদিন সিনেমায়। কথা আছে, একদিন ওদের থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে।

॥ বারো ॥

হরিশের যেন বাক্‌রোধ হয়েছে।

প্রতি রাত্রে সে দেখতে পায় শ্রীগোপাল গোঁসাই এসে শশিমুখীর ঘরে ঢোকে। রাত একটা তুটো নাগাদ বেরিয়ে চলে যায়। শশিমুখীর প্রতিহিংসা নেবার কথা ননীর মায়ের কাছে শুনেছে হরিশ। দেশময় কেলেঙ্কারির ভয়ে একদম চুপ হয়ে গেছে।

কাজ নেই। একদম কাজ নেই হরিশের। ক'জোড়া চাকা তৈরী হয়ে পড়ে আছে কারখানায়। খরিদ্দার নেই। বড় সড়ক পাকা করা হয়েছে, সেখান দিয়ে দিনরাত লরী যায়। কাঠ যায়, বস্তা বস্তা চাল যায়, ধান যায়, পাট যায়—বসে বসে দেখে হরিশ।

একটা চরম অসহায়তা ছটফট করে মনের মধ্যে। কী করবে ভেবে পায় না। কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে। এমন কিছু, যাতে ওই লরীগুলো চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু হয় না। কিছুই হয় না। সদম্ভে ও সগর্বে হর্ন বাজিয়ে লরীগুলো ছুটোছুটি করে। পরাজিতের মতো কারখানার ধারে বসে থাকে হরিশ—কবে কোন্ লগ্নে গঙ্গা পেরিয়ে রাঢ় থেকে গরুর গাড়ি আসবে, যার চাকা কমজোরী।

একদিন ঘাটে গেছে হরিশ চান করতে। দেখলো আর-এক পাশে শ্রীগোপালও চান করছে। কেউ কোথাও নেই দেখে হরিশ বললো—ইটা ক্যানে কোর্‌ল্যা গোঁসাই?

—কূন্‌টা?

—আমার ব্যাটার বৌটাকে নষ্ট কোর্‌ল্যা ক্যানে তাই শুধাছি।

—মিস্তিরী, তাহেলে সত্যি কথা বলি তুমাকে। আমি উয়াকে না দেখলে শশি বাজারে ঘরভাড়া লিতো। বুঝ্ল্যা? তোমার ব্যাটার বৌ হোছে হস্তিনী মেয়্যাছেল্য়্যা। উয়ার খিদ্য়্যা মিটে না কিছুতে। তেবে শুনে রাখো, বাজারে ঘরভাড়া করতে উয়াকে আমি দিবো না। আমি উয়াকে দীক্ষা দিব। তোমরা তো বাবার কাছে দীক্ষা লিয়েইছো, উয়াকেও মন্তর দিব।

হরিশ একরকম করে বুঝে নেয় যা হয়েছে ভালর জন্যেই হয়েছে। হস্তিনী মেয়েছেলে ঘরে থাকতে চায় না। সে পাগলের মতো পুরুষ খুঁজে বেড়ায়। সেই লজ্জার হাত থেকে তো বেঁচেছে হরিশ। নাহলে নতুনগঞ্জে বাস করাই যেতো না।

অমিয়ার আবার বাচ্চা হবে।

এক ছেলে—এক মেয়ে। সংসার তো আনন্দেরই। শুধু যদি চাকা বানানোর কাজটা থাকতো তাহলে আর কোন দুঃখ ছিল না হরিশের।

দুলাল কোলকাতায় গিয়ে সরোর কাছে আছে। ওর ভাল-মন্দের ব্যবস্থা তারাপদই করে দেবে।

ননী নতুনগঞ্জ বাজারে কাঠের চেয়ার টেবিল খাট ইত্যাদি তৈরি করার দোকান করেছে। তা খরচ-খরচা বাদ দিয়ে দৈনিক পাঁচটা থেকে দশটা টাকা আনে ননী। বেশ ভালভাবেই চলে যাচ্ছে সংসার।

কিন্তু হরিশ শান্তি পায় না তাতে। ছেলের রোজগারে বসে বসে খাওয়া। তার কপালে যে কোনোদিন এই ঘটবে কে জানতো!

শশিমুখী সেদিন মাংস রান্না করেছিল তার ঘরে। দুপুরে খেতে বসে পাতের কাছে মাংসের বাটি দেখে হরিশ প্রশ্ন করলো —মাংস কুন্খান থেক্য়্যা এলো নোন্য়্যার মা?

—বড়বৌ পাঠিয়ে দিয়্যাছে।

—কুন্ শালা বড়বৌ?

—গির্‌শ্যার বৌ।

কিছুক্ষণ কটমট করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থেকে হরিশ বললো—লিয়ে যা! সরিয়ে লে বাটি! নাহেলে তোর মাথায় ভাঙবো এই কাঁসার বাটি!

নিঃশব্দে বাটি সরিয়ে নিলো ননীর মা। রগচটা মানুষ। কী করতে কী করে বসবে তার ঠিক নেই। গজগজ করতে করতে খাওয়া শেষ করলো হরিশ মিস্ত্রী।

—নোন্‌য়্যাকে বলিস কাল মাংস লিয়ে আসতে।

—আচ্ছা। জবাব দিল ননীর মা।

বাপের বাড়ি বাচ্চা হতে যাবে অমিয়া।

আগের দিন বিকেলে অমিয়া চুপি-চুপি গেল বড় জায়ের ঘরে। শাশুড়ী বাড়িতে নেই। কথকতা শুনতে গেছে বাজারে বড় গোবিন্দ-বাড়িতে। ঘরে তালা লাগিয়ে অমিয়া গিয়ে শশিমুখীর সঙ্গে গল্প করতে বসলো। একথা সেকথার পর অমিয়া বললো—এমন কাজই কোর্‌ল্যা দিদি যে সাহস কোর্‌য়্যা তোমার ঘরে যে আসবো তারও উপায় নাই।

—আসিস্‌ন্যা ছোট। আমি একলা আছি, একলাই থাকবো।

—গোপাল ঠাকুরকে ঘরে ডাক্‌ল্যা ক্যানে? খাগড়ায় দাদার কাছে চোলে গেল্যাই পারত্যা!

—কী হতো গিয়্যা?

হাসলো অমিয়া।

বললো—তাহেলে আর বাহিরের লোককে ডাকতে হতো না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শশি বললো—তাহেলে তোকে আজ একটা কথা বলি ছোট। তোর কপাল ভাল, তাই ঠাকুরপোর সঙ্গে বিহা হোয়্যাছে। আমার কপাল পুড়া।

—ক্যানে? ইকথা বুলছো ক্যানে? দাদা তোমাকে তো খুব ভালওবাসে।

—তা বাসে।

—তেবে ইকথা বুলছো ক্যানে দিদি?

অমিয়ার দিকে চেয়ে আছে শশিমুখী। ম্লান বিষণ্ণ মুখ। দেখতে দেখতে তার বড় বড় দুটি চোখের কোলে জল জমে উঠলো।

—দিদি! কী হোয়্যাছে গো? দাদা কি—

—তোর দাদা পুরুষমানুষই লয় ছোট,—পুরুষও লয়, মেয়্যাও লয়—কিছুই লয়।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো অমিয়া শশিমুখীর দিকে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল অমিয়ার চোখ দিয়েও জল পড়ছে।

দুজনে নিঃশব্দে কাঁদলো অনেকক্ষণ। কেউ কোন কথা বললো না। বলার কিছু ছিলও না। কী থাকতে পারে?

একটি নারী যদি বিয়ের পর দেখে যে তার স্বামী নপুংসক, তাকে ঠকানো হয়েছে, তখন যদি সে গোপাল ঠাকুরকে তার ঘরে ডেকে আনে, তাহলে মানুষ তাকে দ্বিচারিণী বলে কোন্ লজ্জায়?

অনেকক্ষণ পরে অমিয়া উঠে চলে গেল।

॥ তেরো ॥

তারাপদ মায়ের অসুখের খবর পেয়ে কৃষ্ণনগর গেছে।

দুলাল গেছে সিনেমা দেখতে।

বেলা দুটো। বাইরে খাঁ-খাঁ করছে রোদ্দুর।

অনেকক্ষণ শুয়ে রইলো সরোজিনী। কিন্তু রবিবারের দুপুর এমনিতেই দীর্ঘ। হঠাৎ কী মনে করে উঠে বসলো সরোজিনী। বাচ্চা চাকর কানাইকে ডেকে বললো--আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি। দুলাল-দাদাবাবু যদি এর মধ্যে বাড়ি ফেরে, হালুয়া করা আছে—খেতে দিবি। বুঝলি?

—হ্যাঁ।

—চা এনে দিবি দোকান থেকে। কী বুঝলি?

—চা এনে দেব।

—হ্যাঁ। আর আমি বেরিয়ে গেলে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তুই বাড়িতেই থাকবি।

—আচ্ছা।

শাড়ি পাল্টাবার কোন দরকার নেই। ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে মুখখানাকে একটু ঘষে নিলো সরোজিনী। তারপর কানাইকে দরজা বন্ধ করতে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

মন্থর দুপুরবেলা।

সুহাস শুয়ে শুয়ে 'এম্প্‌টি ক্যান্‌ভাস্‌' উপন্যাসটি পড়ছিল। পড়তে পড়তে এমনই মন বসে গেছে যে কখন সরোজিনী কড়া নেড়েছে, কখন পাঁচু-চাকর দরজা খুলে দিয়েছে, আর কখন যে

সরোজিনী সুহাসের শোবার ঘরে ঢুকে মাথার কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে, টেরই পায়নি।

কিছুক্ষণ পরে সরোজিনী একটু কেশে বললো—বইটা বুঝি খুবই ভাল?

চমকে উঠে বসলো সুহাস। ভূত দেখার মতো চেয়ে থাকলো

তারপর বললো—কাণ্ডটা কী? ভর্ত্তি দুপুরবেলায় ভূতেই তো ঢ্যালা মারে বলে শুনেছি, মেয়েতেও ঢ্যালা মারে নাকি?

—মারেই তো! বলে হেসে সরোজিনী বিছানার একধারে বসলো।

—সত্যি বলো, কী ব্যাপার?

—ব্যাপার আবার কী! কর্তা গেছেন কেষ্টনগরে, তুলো গেছে সিনেমায়, আমি মানুষটা করি কী? ভাবলাম—রোববার যখন, তখন নিশ্চয় তুমি বাড়িতেই আছ। তাই চলে এলাম তোমার সময় নষ্ট করতে। যদি নষ্ট করতে না চাও, তবে এক্ষুণি চলে যাব।

—দরজা খুলে দিলে কে?

—পাঁচু।

—সে জেগে ছিল?

—হুঁ। এই বলে সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে বললো সরোজিনী।—কী হলো তোমার? মুখ-চোখ অত লাল দেখাচ্ছে কেন?

—এই সর্বনেশে বইটা।

—সর্বনেশে মানে?

—মানে—এতে একটি মেয়ের গল্প আছে, দেহ দান করে যার তৃষ্ণা মেটে না।

—বল কি গো। বড় ভাল বই তো। তারপর ?

—একজন প্রৌঢ় শিল্পী মেয়েটিকে পেল। উচ্ছৃঙ্খল বেহিসেবী মেলামেশার ফলে মারা গেল সে। মেয়েটিকে ধরলো আর একজন যুবক শিল্পী। শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম—কী উত্তাল, উদ্দাম ওদের জীবনসম্ভোগ! কিন্তু এতেও হলো না। এই শিল্পীকে লুকিয়ে মেয়েটি অন্য লাভারের কাছেও যাওয়া-আসা করতো।

সুহাসের কাছে একটু সরে এসে সরোজিনী বললো—সর্বনেশে বই-ই বটে। তারপর কী হলো মেয়েটার ?

—এখনো শেষ করতে পারিনি। শেষ হলে তোমাকে বলবো গল্পটা।

সরোজিনী জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল।

দক্ষিণদিকের জানলার পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। একটু দূরে অন্য একটা বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখা যায়। লাল হয়ে উঠেছে ফুলে ফুলে।

—কী দেখছো ? জিগ্যেস করলো সুহাস।

—ওই কেষ্টচূড়ো গাছটা। মনে আছে নতুনগঞ্জে আমাদের কারখানার সামনের সেই বিরাট মাঠটার মধ্যে চার পাঁচটা কেষ্টচূড়ো গাছ দেখা যেতো। তাই না ?

—হ্যাঁ।

—কোলকাতায় কিছুই ছাই বোঝবার উপায় নেই। না শিমূল-পলাশ-অশোক, না একটা কোকিলের ডাক। কালকে জান দুপুরবেলায় আমার ঘরে একটা ভোমরা ঢুকে পড়েছিল।

—তারপর ?

—তারপর এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে কিছুক্ষণ মাথা ঠুকে ভোঁ করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কী দেখছো ?

—তোমাকে দেখছি।

—আমার মধ্যে এত দেখবার কী আছে ?

—অনেককিছু আছে। তোমার মুখের দিকে চাইলে আমি আমাদের সেই ছেলেবেলাটাকে দেখতে পাই। সেই পাশাপাশি বসে তুজনের পাঠশালায় পড়া দেখতে পাই। আমাদের গঙ্গার ধারের সেই মিলনটা দেখতে পাই। দেখতে পাই তোমার সেই কান্নাভেজা সুন্দর মুখখানি।

—এত জিনিস একসঙ্গে দেখতে পাও ?

—পাই।

—আমাকে একটু দেখাও না !

—দেখবে ?

সুহাসের চোখের দিকে চেয়ে সরোজিনী হঠাৎ বললো—না, থাক্।

চুপচাপ।

পাশের বাড়িতে একটা ছেলে তারস্বরে বোধহয় পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে—তারই একঘেয়ে একটানা আওয়াজ ভেসে আসছে। আরো দূরে কোন একটি মেয়ের গানের মাস্টার এসেছে বোধহয়। সে শুধু একটা লাইনই গেয়ে চলেছে ঃ

'জীবনের যত পূজা হলো না সারা।'

সরোজিনী হাসলো।

বললো—গান গেয়ে বললেই বা কী হবে ? জীবনে কারো পূজাই সারা হয় না।

—তোমারও হয়নি ?

—নাঃ !

—কোন্ দেবতার পূজো করতে তুমি ?

—করতে কেন ? এখনো তো করি।

—কার ?

—তোমার।

খাট থেকে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালো সুহাস। চেয়ে রইলো বাইরের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে তার দিকে চেয়ে থেকে সরোজিনীও উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো। বললো—কী ভাবছো ?

—ভাবছি—। ভাবছি—তুমি হঠাৎ কেন এলে ? সব জিনিস এখানে সাজানো-গোছানো আছে। হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকে ওলোটপালোট লণ্ডভণ্ড করে দেবে, সেটা কি ঠিক ?

—বল তো চলে যাই।

—না। যদি কেউ ছাখে যে তুমি নির্জন দুপুরবেলায় একলা আমার ঘরে এসেছো। কী হবে ?

—কী আবার হবে ?

—নিন্দে হবে না ?

—নতুন হবে না।

—তার মানে ?

—নতুনগঞ্জে যে নিন্দে শুনেছি, কোলকাতায়ও না হয় সে নিন্দে শুনবো।

—তোমার খুব সাহস—না সরো ?

—একজনের সাহস না থাকলে আর একজনকে সাহসী হতেই হয়। তুমি চিরকালের ভীতুর ডিম।

হাসলো সুহাস।

বললো—সরো, আমার ঘরে এসে ভাল করনি। যৌবনের আরম্ভে আমরা। যাই হোক, সেটা খুব বেশী দোষের কিছু নয়।

কিন্তু আজ তুমি পরস্ত্রী। যদি নীতি ধর্ম ইত্যাদি এসব মানতে হয় তাহলে তোমার গায়ে হাত দেওয়া আমার উচিত নয়।

—মানতে হয় তুমি মানো, আমি মানবো না।

—মানবে না?

—না।

—কেন বল তো?

—কেন নয়? যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে সে মানুষ নয়—নিজেও একটা বই। তুটো রান্না করে দেওয়া, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা, টাকা-পয়সা আলমারিতে রাখা—এ ছাড়া আমাকে তার আর কোন দরকার নেই।

—সেকি!

—হ্যাঁ। বারে-বারে তাকে 'এই যে আমি' 'এই যে আমি' বলে মনে করিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কিন্তু কী? মানুষটা খুব ভাল। বিদ্বান, বুদ্ধিমান—ভাল অধ্যাপক, তাতে আমার কী? তুমি জান আমার বড়বৌদি আলাদা একটা বাড়িতে থাকে। তার ঘরে একদিন পাওয়া গেল গোপাল ঠাকুরকে। সবাই বললে—কলঙ্কিনী শশিমুখী। কিন্তু আমি তো জানি আমার বড় ভাই কী। আমি হাজারবার মাকে মানা করেছিলাম দাদার বিয়ে দিতে।

—কেন?

—দাদা পুরুষও নয়, মেয়েও নয়, কিছুই নয়। কিন্তু শশিমুখী মেয়ে। তার একটা চাওয়া আছে। সেইটে চাইতে গেলেই হয়ে যাবে অন্যায়।

—সরো, তারাপদ কী—

—না। সে পুরুষমানুষই বটে। কিন্তু মনের মধ্যে সে ওই আমার দাদার মতোই একটা কিছু-না। নিজেকে বঞ্চনা করে একদিন থাকা যায়, হ'দিন থাকা যায়, কিন্তু চিরদিন থাকা যায় না। ঠিক আছে—দুপুরবেলায় আমি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করেছি বলে কিছু মনে কোরো না। আমি চলে যাচ্ছি।

এই বলে সরোজিনী পা বাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়লো সুহাসের বাহুবন্ধনে।

তাকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সুহাস।

সুহাসের পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সরোজিনী।

ঘুম ভাঙলো যখন, তখন বেলা পাঁচটা বেজে গেছে।

চেয়ে দেখলো সুহাস পরিপূর্ণ শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সুহাসকে দেখলো সরোজিনী। তারপর আস্তে আস্তে কোন শব্দ না করে দরজা খুলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

দুলাল তখনো সিনেমা থেকে ফেরেনি।

কানাই একঘুম ঘুমিয়ে উঠে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছিল।

সরোজিনী গিয়ে চা তৈরি করলো—নিজে খেলো, কানাইকে দিল। তারপর বাথরুম থেকে চান করে ফিরে এসে কিছু খাবার তৈরি করে রাত্রে নিজে খাবার জন্যে রাখলো। দুলালের জন্যে ঢাকা দিল।

সমস্ত শরীরে ক্লান্তির আবেশ। নেশার ঘোরে কাজ করছে যেন সরোজিনী। বাইরে তুজন হিন্দুস্থানী ঝগড়া করছে—গান বলে মনে হলো সরোজিনীর।

তুলাল এল রাত আটটার পরে।

অন্যদিন তাকে অনেক কথা জিগ্যেস করে সরোজিনী। কোথায় গিয়েছিল, কোন্ সিনেমা, কেমন ছবি, গল্পটা কী? কিন্তু আজ আর সে-সব কিছু প্রশ্ন করলো না। ভাইকে খেতে দিল, নিজে খেয়ে নিল। কানাইকে বললো কাজকর্ম সেরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে।

রাত ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়লো সরোজিনী। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম—প্রগাঢ় ঘুম।

একেবারে একঘুমে ভোর হয়ে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

নতুনগঞ্জে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলো।

চারখানা মাল-বোঝাই লরী দাঁড়িয়ে ছিল হরিশের কারখানার একটু আগে।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল বলে ড্রাইভাররা রাতের মত বাজারে খাওয়াদাওয়া সেরে হরিশের কারখানায় শুয়ে ছিল। ভোরে উঠেই বিপত্তি। দেখলো চারখানা লরীর ষোলোখানা চাকাই কে যেন ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে রেখে গেছে। এমনভাবে কেটেছে যাতে একখানা লরীও আর যাবার মতো অবস্থায় নেই।

বেলা দশটা নাগাদ পুলিশ এল। কিন্তু পুলিশ এসে কী করবে? যে কেটেছে সে তো কোন প্রমাণ রেখে যায়নি। মাল যাবে ভগবানগোলা কিষ্টপুর, গঙ্গা পেরিয়ে রঘুনাথগঞ্জ।

কোলকাতা থেকে টায়ার আনাতে বহু সময় লেগে যাবে। কাজেই অনেক পরামর্শের পর স্থির হলো ষোলোখানা গরুর গাড়িতে এই চার লরীর মাল ভর্তি করা হবে।

গরুর গাড়ির পাত্তা হরিশই এনে দিল। কিন্তু মুশকিল হলো, সব গরুর গাড়ি ঠিক কর্মক্ষম অবস্থায় নেই। দু' তিনখানা গাড়ির চাকা খারাপ। যে সরকার লরীগুলোর তদারকে ছিলেন তিনিই চাকার টাকা দিলেন। তিন জোড়া পেহার টাকা ঘরে তুললো হরিশ।

সেদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো ননীর মায়ের চীৎকারে।

হরিশ ধড়মড় করে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরোলো। শশিমুখীর ঘরের কাছে লোকজনের ভিড়। সবাইকে ঠেলে হরিশ দাওয়ায়

উঠে শশিমুখীর ঘরে ঢুকলো। শশিমুখীর দেহ ঘরের মাঝখানে শূন্যে ঝুলছে।

আত্মহত্যা বলে কথা!

লাশ চালান গেল বহরমপুরে।

দু'দিন পরে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এল—শশিমুখীর পেটে বাচ্চা ছিল চার মাসের।

বহরমপুরের ঘাটেই দাহ করে এল পুত্রবধূকে হরিশ। সঙ্গে ননী ছিল। পুলিশ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিল না। তারা অনুসন্ধান শুরু করলো।

খোঁজখবর নিতে নিতে দিনদশেক পরে পুলিশ শ্রীগোপাল গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করলো।

নতুনগঞ্জে নতুন করে উত্তেজনা শুরু হলো। শ্রীগোপালের আত্মীয়স্বজন একদিকে, আর একদিকে পুলিশ।

সেদিন রাত এগারোটায় শ্রীগোপালের শ্বশুর বাঞ্ছা গোঁসাই এলেন হরিশ মিস্ত্রীর কাছে।

হরিশ প্রণাম করে প্রভুকে বসতে বললো।

বাঞ্ছা বললেন—আমি সবই শুনেছি। সবই জেনেছি। পরকীয়া প্রেমে যে কী রস, কী মোহ আর কী আনন্দ তা বৈষ্ণব পদকর্তারাই জানতেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ পোভু। কিছু না বুঝে হরিশ বললো।

বাঞ্ছা নবদ্বীপের গোঁসাই। তাঁর কথাবার্তার ঢংই আলাদা। তিনি হরিশকে বোঝালেন—মেয়েটির জীবন শেষ হয়ে গেছে। সে আর ফিরবে না। শ্রীগোপালকেও তোমরা ছেলেবেলা থেকে দেখছ। কাজেই তার কোন ক্ষতি হোক, এটা নিশ্চয় তোমরা চাও না। অতএব সত্যি সাক্ষ্য দিয়ে লাভ আছে কি কিছু?

—আজ্ঞে না পোভু। হরিশ জবাব দিল।

—কাজেই শ পাঁচেক টাকা নিয়ে গোপাল যাতে বেরিয়ে আসতে পারে সেইভাবেই চেষ্টা করা উচিত তোমাদের।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে এই আড়াইশ টাকা রাখো। পরশু সাক্ষী দিতে যাবার আগে বাকী আড়াইশ পাবে। তোমার ছেলে ননীকেও দু'শ দেওয়া হবে। এই তার একশ। পরশু বাকী একশ।

—আজ্ঞে আচ্ছা।

—বুঝলে না হরিশ, যৌবন অতি চঞ্চল ব্যাপার। মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। যাতে সে ভাল থাকে সুখে থাকে সে চেষ্টা করতে হবে বৈকি। যাই হোক,আমি চললাম। আর যেন কোন গোলমাল না হয়।

—হবে না পোভু। বললো হরিশ।

—যদি গোলমাল হয়—কথার কথা বলছি—তাহলে তোমার বড়ছেলেটি যে নপুংসক, সেটাও কোর্টে প্রমাণ হবে। সেটা বোধহয় তোমার পক্ষে খুব ভাল হবে না। অতএব ভালয় ভালয় মিটে যাওয়াই ভাল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চিঁ চিঁ করে বললো হরিশ।

॥ পনেরো ॥

প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে গেল শ্রীগোপাল।

হরিশের বাড়ির সামনে আবার দুটি লরী জখম হলো। মজা এই যে, খালি লরী সারারাত থাকলে কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু মাল-বোঝাই লরী দাঁড়ালে আর রক্ষে নেই। বিশেষ করে রাত্রে।

অতএব থানা থেকে পুলিশ পাহারা বসলো।

হরিশের বাড়ির কাছেই রাস্তার ধারে একটা চায়ের ও রুটি-মাংসের দোকান হয়েছিল। লরীর ড্রাইভাররা যেতে আসতে সেখানে গাড়ি থামিয়ে খাওয়াদাওয়া করে নেয়। বিশেষ করে যে-সব গাড়ি কোলকাতার দিক থেকে আসে।

সেদিন অনেক রাত।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী কি চতুর্দশী তিথি।

সন্ধ্যে থেকেই টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রায় সাত আটখানা লরী রাত্রের মতো বিশ্রাম গ্রহণ করছে হোটেলের সামনে।

হোটেলের মালিক পাশেই একখানা আটচালা তুলেছে—তাতে একটি করে তক্তাপোষ, একটি তোষক, একটি বালিশ দিয়ে প্রায় বারোটি তক্তাপোষের ব্যবস্থা আছে। লরীর ড্রাইভাররা খাওয়াদাওয়া করে এখানে রাত্রে ঘুমোলে এক টাকা চার আনা বেশী দিতে হয়।

সেদিন আটজন ড্রাইভার গাড়ি রেখে বাজার থেকে মদ খেয়ে এসে হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে।

যে পুলিশ পাহারায় ছিল—সে আর শীতের রাতে বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছে হরিশের কারখানায়।

রাত বারোটা পর্যন্ত তার সঙ্গে গল্প করে তারপর শুতে গেছে হরিশ মিস্ত্রী।

টিপ-টিপ বৃষ্টি আর শীত, দুটোই ভাল করে ঘুমোবার পক্ষে প্রশস্ত। কাজেই সব ঘুমে নিশ্চেতন। হঠাৎ ড্রাইভার উধম সিংয়ের বাইরে যাবার প্রয়োজন হলো। সে আটচালার ঝাঁপটি নিঃশব্দে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো। শুনলো, লরীগুলোর একটার নীচে থেকে খর্‌র্‌র্‌ খর্‌র্‌র্‌ করে কিছু একটা কাটার শব্দ হচ্ছে। উধম সিং কাউকে না ডেকে নিঃশব্দে নিজের বিছানার পাশ থেকে স্টার্ট দেবার লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল। চুপি-চুপি ঘুরে লরীগুলোর ওদিকে গিয়ে দেখলো—অন্ধকারের মধ্যেই বেশ বোঝা গেল—একটা লোক উবু হয়ে হাত-করাত দিয়ে টায়ার কাটছে। সে তন্ময় হয়ে কাজ করছিল বলে উধম সিংয়ের উপস্থিতি টের পেল না। উধম সিং হাতের ডাণ্ডাটা তুললো, তারপর সবলে সেই লোকটার মাথায় বসিয়ে দিলো।

ফটাস্‌ করে মাথার খুলি ফেটে যাবার শব্দ হলো।

উধম সিং পেছন ফিরে না চেয়ে সোজা ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

ভোরবেলায় লোকে লোকারণ্য।

হরিশ মিস্ত্রী একটা টায়ারের কাছে মরে পড়ে আছে, মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

কাছেই একটা হাত-করাত পড়ে আছে।

প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, কিন্তু হরিশের মাথার কাছেই একটা গরুর গাড়ির চাকার গভীর দাগ থাকাতে রক্তস্রোত সেই পথটা দিয়ে বয়ে গেছে···

ছ'খানা লরীর চাকাই খতম। সাত নম্বর গাড়ির প্রথম চাকাটা সবে ধরেছিল হরিশ।

॥ ষোলো ॥

সেই দিনটাতেই—

রাত তখন নটা সাড়ে-নটা।

কোলকাতার আকাশেও মেঘ। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে লেপের তলায় ঢুকেছে সুহাস। মাথার কাছে টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বেলে একটা বই পড়ছে সে।

কোলকাতাতেও সেদিন খুব শীত।

হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে পাঁচু কাজকর্ম প্রায় শেষ করে এনেছে। এমন সময় দরজায় দুম-দুম করাঘাত। খট্-খট্ করে কড়া নড়তে লাগলো।

পাঁচু গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলো সরোজিনী দাঁড়িয়ে।

—তোর বাবু ফিরেছে ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন।

সরোজিনী আর কোন কথা না বলে দালান দিয়ে হেঁটে গিয়ে সুহাসের ঘরে পর্দা ঠেলে ঢুকলো।

সুহাস চাইলো। হাঁপাচ্ছে সরোজিনী। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে! সেই সেদিনের পর আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি সুহাসের।

সরোজিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বিছানায় সুহাসের পাশে বসলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—তুমি কি আমাকে দু'শটা টাকা দিতে পার ?

—কেন ?

—পার কি না তাই বল না!

—বললাম তো, পারি। কিন্তু কেন ?

—সন্ধ্যে থেকে দুলালের পাত্তা নেই। একটু আগে আলমারি থেকে একটা শাল বার করতে গিয়ে দেখলাম, ও যে দু'শ টাকা আলাদা রেখে গিয়েছিল সেই দু'শটা টাকা নিয়ে দুলো পালিয়েছে। অথচ কেষ্টনগর থেকে ও হয়তো আজ রাত্রেই ফিরবে। আমি কী বলবো কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই ভাবলাম তোমার কাছে যদি থাকে—তাহলে সেটা আপাততঃ ওকে দিয়ে, তারপর—

—যা হয় হবে। বলে সুহাস একটি কাণ্ড করে বসলো। চোখের পলকে বাঁ-হাত বাড়িয়ে টেবিল-ল্যাম্পটি নিভিয়ে দিয়ে ডানহাতে সরোজিনীকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিজের বুকের উপর তুলে নিল, এবং দেখা গেল সুহাসের লেপের তলায় সরোজিনী ঢাকা পড়ে গেছে।

—আচ্ছা, কী হচ্ছে এটা ? ছাড়ো, ছাড়ো! তুমি উঠে টাকা দাও, আমাকে বাড়ি যেতে হবে। এই দেখ! আমার কথা শোন লক্ষ্মীটি! সুহাস, শোন, শোন! ওর যে আজকে রাত্তির এগারোটার গাড়িতে—

কথা কওয়ার পথটাও বন্ধ হয়ে গেল সরোজিনীর।

তারপর ?

কোথায় সমাজ ? কোথায় সংসার ? কে বামুন, কে শূদ্র তার খোঁজ কে রাখে! কার নাম তারাপদ—দুলালই বা কে, কোথাও কোন জিজ্ঞাসা অবশিষ্ট রইলো না।

উন্মাদনার উন্মত্ত রাত্রি প্রভাত হলো।

অন্ধকার থাকতেই সুহাস উঠে পড়ে দু'শ টাকা বার করে সরোজিনীকে দিয়ে দিল।

সরোজিনীর সারারাত্রি জাগরণক্লান্ত দুটি চোখ লাল হয়ে আছে। এক ফোঁটা ঘুমুতে দেয়নি ওকে সুহাস। নিজেও ঘুমোয়নি।

শান্তশিষ্ট, ভদ্র ও শিক্ষিত অধ্যাপক তারাপদ ভাস্করের স্ত্রী সরোজিনী দাসী পুরুষের এই দস্যুতার খবর রাখে না। এই যে বাজপাখীর ভীরু পায়রাকে ধরে দুঃসহ আনন্দে ও ক্ষুধায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলা—এর তীব্র বেদনাময় আনন্দের স্বাদ তো সরোজিনী জানে না। তাই রভস-রসায়িত রাত্রিশেষে সরোজিনীর পা যেন আর চলতে চাইছিল না। দুটো পা-ই কাঁপছে ঠক-ঠক করে।

রাস্তায় নেমে তার মনে হলো যদি রাত এগারোটার গাড়িতে তার স্বামী বাড়িতে এসে থাকে?

মন বলে—এসে থাকে, এসেছে। আমি সব কথাই বলবো ওকে। কোন কথাই গোপন করবো না। তারপর যদি শাস্তি দিতে হয়, দেবে। এই এক রাত্রির আনন্দের বদলে হাজার রাত্রির নির্যাতন সইতে রাজী আছে আমার দেহ।

সুহাস আমার। সুহাস আর কারো নয়। ছেলেবেলা থেকে ও আমার। যখন জ্ঞান হয়নি তখন কালকিসিন্দে ফুলের মালা গেঁথে মালাবদল করেছি আমরা। ও আমার, আমার, আমার······

এই কথাগুলোই যেন গান হয়ে বাজছে সরোজিনীর মনে।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই।

বাড়ির দরজা খোলা। কানাই বারান্দায় বসে কাঁদছে। সরোজিনীকে দেখেই সে চমকে উঠলো।

—মা!

—হ্যাঁ।

—তোর বাবু—বাবু ফিরেছেন?

—হ্যাঁ, কাল রাত বারোটার সময় ফিরেছেন, তারপর থেকে একবার থানা একবার বাড়ি এই করছেন। এই একটু আগে আবার থানায় গেলেন।

—কেন?

—পুলিশ আপনার কোন খবর পেয়েছে কি না জানতে।

কোন কথা না বলে সরোজিনী ওপরে উঠে গেল। দু'শ টাকা আলমারিতে রাখলো। তারপর কানাইকে এক কাপ চা দিতে বললো।

—দুলালবাবু এসেছিল?

—না, মা।

—ঠিক আছে। এক কাপ চা দে আমাকে।

একটু পরেই ফিরে এল তারাপদ। সিঁড়ি দিয়ে তাকে উঠতে উঠতে বলতে শোনা গেল—

—অ্যাঁ! ফিরে এসেছে? কানাই, তুই তাহলে বাবা দৌড়ে থানায় গিয়ে বলে আয় যে উনি ফিরে এসেছেন—আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না।

—মাকে এক বাটি চা দিয়ে যাচ্ছি বাবু!

—আচ্ছা।

পর্দা ঠেলে তারাপদ ঘরে ঢুকলো। এক রাত্রে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো—কোথায় ছিলে তুমি?

—সুহাসের বাড়িতে।

—কেন ?

—একটু দরকার ছিল। কিন্তু শরীরটা এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ি। সারারাত ধরে ব্যাচারা আমার সেবা করেছে।

—হ্যাঁ। চোখের নীচে এত কালি তো তোমার ছিল না। মুখ-চোখ শুক্‌নো। চুলটাও তো আঁচড়াওনি। ছি ছি ছি! দেখ দিকিনি! ওঁর চাকরটাকে দিয়ে একটা খবর দিয়ে পাঠালেই

—যাকগে, তুমি শুয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে নাও কিছুটা। আমি সকাল আটটার গাড়িতে আবার কেষ্টনগর যাচ্ছি। চার পাঁচদিন দেরি হবে। তুমি ওই দু'শ টাকা আমায় বার করে দিয়ে শুয়ে পড়ো।

সরোজিনী আলমারি খুলে দু'খানা একশ টাকার নোট বার করে স্বামীর হাতে দিল।

—খুচরো টাকাগুলোকে গোটা করে রেখেছ কেন ? বেশ করেছ— তুমি শুয়ে পড়ো।

তারাপদ চলে গেছে।

দুপুরে সরোজিনী সুহাসের বাড়িতে গিয়ে শুনলো যে সে ইউনিভার্সিটিতে গেছে। পাঁচুকে বলে এল—তোর বাবুকে বলে দিস, রাত্রে আমার ওখানে খাবে।

সন্ধ্যের পরই সুহাস এল। বললো—তারাপদ কোথায় ?

—কেষ্টনগরে।

সরোজিনীকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়ে সুহাস বললো—কী বললো ভোরে তোমাকে দেখে ?

—কী আবার বলবে ? থানায় দৌড়োদৌড়ি করেছে সারারাত। তুমি খাবে এখানে—বলেছে পাঁচু ?

—হ্যাঁ।

গলাটা নামিয়ে সরোজিনী বললো—শোবেও এখানে। সে কথা বলেছে ?

—সে নেমন্তন্নও পাঁচুর কাছে করে এসেছিলে নাকি ?

—না। ঠাট্টা করলাম।

কোন কোন বৈশাখে যেমন পর পর কয়েক দিন ধরে কালবোশেখীর ঝড়-বৃষ্টি হয়, ঠিক সেই কালবোশেখী নেমে এল এই দুটি জীবনের ওপর।

বাল্যকাল থেকে দেখা স্বপ্নের, পরস্পর পরস্পরকে চাওয়া··· কত না-বলা কথা, কত বলা প্রতিশ্রুতি—সব যেন রূপ পেতে লাগলো ওদের এই মিলনে।

চার দিন কাটলো এইভাবে।

সন্ধ্যেয় আসে সুহাস। ভোরে চলে যায়। সারাদিন কী করে তা নিজেই জানে না।

পাঁচ দিনের দিন ভোরে তারাপদ ফিরে এল।

কানাই গিয়ে বলে এল সুহাসকে। কানাই বুঝেছিল। কিন্তু সরোজিনী তাকে বলে দিয়েছে—যা দেখেছিস, ঠিকই দেখেছিস। কিন্তু একটা কথাও যেন প্রকাশ না পায়।

॥ সতেরো ॥

ঠিক তিন মাস পরে।

সরোজিনী সুহাসের বাড়িতে গেল। পাঁচুর কাছে শুনেছিল যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মত হয়েছে বলে সুহাস বেরোবে না আজ।

সুহাস শুয়ে ছিল।

সরোজিনী গিয়ে তার বুকের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললো—এবার কী করবে অধ্যাপক ?

—কেন ?

—'বাবা' বলে ডাকার লোক আসছে যে !

সরোজিনীকে আনন্দে সবলে চেপে ধরলো সুহাস। দুজনে মিলে ঠিক করলো যে আর দেরি করা ঠিক হবে না। তারাপদকে বলে তারা মুক্তি চেয়ে নেবে। সোজাসুজি বলাই ভাল।

—আমি ওর ঘাড়ে চাপাতে পারি এই দায়িত্ব। কিন্তু কেন তা করবো ?

—নিশ্চয় করবে না। সন্তান আমার, দায়িত্ব আমার। আমাদের অনেক স্বপ্নের অনেক আনন্দের সন্তান।

পরের দিনই তারাপদকে ডেকে বললো সুহাস। প্রথমটা তারাপদর মুখ-চোখ সব লাল হয়ে উঠলো। তারপর বললো—সরোর মত আছে ?

—হ্যাঁ।

—তাই হবে। আমি জানি আমার কাছে ও সুখী হতে পারেনি। ওর মন আপনাকেই চাইত দিনরাত। তাছাড়া—

ঠিক আছে। একটা অনুরোধ করবো? ওকে মিস্ট্রেস্ করে রাখবেন না। বিয়ে করবেন।

—নিশ্চয় বিয়ে করবো তারাপদবাবু। আপনার মহত্ত্ব আমরা জীবনে ভুলবো না। মনের মধ্যে এত প্রশান্তি আপনি কী করে পেলেন তাই ভাবি।

রাত্রে তারাপদ স্ত্রীকে বললো—সুহাসবাবু আমাকে সব কথা বলেছেন। ঠিক আছে।

দেখা গেল আজ কিন্তু সরোজিনী মুখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে চাইতে পারলো না।

যতীন চক্রবর্তী পুত্রকে জবাব দিলেন :

"যুগধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পারিব না। অতএব তাহা না করিয়া তোমাকে বলিব—তুমি অদ্য হইতে আমার পুত্র বলিয়া আর পরিচয় দিয়ো না। এবং অনুরোধ করিব—আমার জীবিতকালে তুমি নতুনগঞ্জে আসিও না।

ইহাই আমার আদেশ ও অনুরোধ।"

বিয়ে হয়ে গেল ওদের।

কিন্তু তারাপদ যে কোথায় গেল কেউ জানে না। কেউ বলে আত্মহত্যা করেছে, কেউ বলে রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিয়েছে, আবার কেউ কেউ বলে পশ্চিমে মাস্টারি করছে।

কিন্তু আমরা জানি, তারাপদ কোথায় গিয়েছিল। তারাপদ ভাস্কর প্রথম তিনমাস কোলকাতাতেই ছিল। তারপর একদিন তার মনে হ'ল—আর সহ্য করা যাবে না। কারণ, তিন চারখানা বাড়ীর পরেই সুহাসের বাড়ী। কলেজ যেতে একবার দেখা হয়। হয়তো জানলার ধারেই দাঁড়িয়ে থাকে সরোজিনী। চোখাচোখি হ'লে হয়তো জিজ্ঞাসা করে—খাওয়া হয়েছে তো ?

সলজ্জভাবে হেসে বলে তারাপদ—হ্যাঁ, তোমার শরীর ভাল আছে তো ?

—হ্যাঁ।

ব্যস্! ওই অবধি। তারাপদ এগিয়ে যায়। কিন্তু সে অনুভব করে, সরোর চোখ দুটি তখনো তাকে অনুসরণ করছে। ভাবতে থাকে তারাপদ, এ অসহ্য। এই ভাবে দিনের পর দিন দেখা হওয়া, কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে চলে যাওয়া,—একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

সে খবরের কাগজ দেখে ক্রমাগত দরখাস্ত পাঠাতে লাগলো। মাস তিনেক পরেই ডাক এল দিল্লী থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হ'য়ে সে চলে গেল। যাবার সময় সরোজিনীর সঙ্গে দেখাও করে গেল না তারাপদ। গাড়ীতে উঠে মনে মনে বললো—

—তুমি সুখী হও সরোজিনী। ছেলেবেলা থেকে যাকে ভালবেসেছ, তারই হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলে যাচ্ছি। আমি এখানে থাকলে—প্রতিদিন তোমার চোখে পড়তাম, তোমার মনের পক্ষে সেটাও যন্ত্রণাদায়ক। তার থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। তুমি সুখী হও।

॥ আঠারো ॥

কিন্তু সুখী হও বললেই কি একটা মানুষ সুখী হয়, না হ'তে পারে? সুহাস-সরোজিনীর প্রেম তখন আনন্দ আর পরিতৃপ্তির শিখর স্পর্শ করেছে। কিন্তু তারাপদ সম্বন্ধে সে কোন সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। একদিন কথায় কথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটি হ'য়ে গেল।

কথাটা উঠেছিল—তারাপদর অধ্যাপনা নিয়ে। কলেজ থেকে ফিরে জলখাবার খেতে খেতে সুহাস বললো—

—জানো সরো, আজ একদল ছাত্রের মুখে তারাপদবাবুর পড়ানোর কথা শুনছিলাম।

—কী রকম? উনুন থেকে ঘিয়ের কড়াটা নামাতে নামাতে প্রশ্ন করলো সরোজিনী।

—ওরা বলছিল—তারাপদবাবু নাকি ভাল পড়াতে পারতেন না।

—ওরাটা কারা?

—ওঁর ছাত্রেরা।

একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বললো সরোজিনী—তারা মিথ্যে কথা বলেছে।

—কী ক'রে বুঝলে?

—একটা লোক কি ফাঁকি দিয়ে বড় হ'তে পারে গো? এই যে দিল্লীতে লেকচারার হ'য়ে গেল,—যোগ্যতা না থাকলে তারা এমনি এমনি নিয়ে গেল?

—কিছুটা সুপারিশ ছিল নিশ্চয়।

—আজ্ঞে না। মাপ করতে হ'ল। কোন সুপারিশ না নিয়েই গেছে সে। তাছাড়া আমি ওবাড়ী থাকতে তো কত ছাত্র আসতো। তারা ওর পড়ানোর খুব সুখ্যাতি করতো। মাইরি, আমি নিজের কানে শুনেছি।

—স্ত্রীলোকের স্বামী নিন্দে করতে নেই, শাস্ত্রে বলে।

মুহূর্তকাল সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল সরোজিনী। তারপর দুমদাম শব্দ ক'রে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

ভাবিয়ে দিলে সুহাসকে। তাহ'লে তো এখনো তারাপদকে ভুলতে পারেনি সরোজিনী। তাহ'লে কি ভুল করেছে সুহাস—তারাপদর বুক থেকে সরোকে ছিনিয়ে এনে? কিন্তু—!

কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না সুহাসকে। রাত্রে শুয়ে সুহাসকে জড়িয়ে ধরে বললো সরোজিনী—

—খুব রাগ করেছো তো আমার ওপরে?

—কেন?

—তখন অভদ্র ব্যবহার করেছি বলে?

সরোজিনীর গলাটা জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে এনে বললো সুহাস—

—তোমার ওপর যেদিন রাগ করবো, সেদিন তুমি আমার মাথার চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরো।

হেসে স্বামীর বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিল সরোজিনী।

॥ উনিশ ॥

প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে—মানুষের সঙ্গে বিপরীত ধর্মের খেলা—খেলা। যে মানুষ যতো চরিত্রবান, প্রকৃতি খেলে তার সঙ্গে ভ্রষ্ট চরিত্রের খেলা। একটু একটু ক'রে চাপ সৃষ্টি ক'রে—ধীরে ধীরে তাকে সচ্চরিত্রতার স্বর্ণ সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে—পথের ধূলোয় দাঁড় করিয়ে মজা দেখা। তাই প্রকৃতির দৃষ্টি পড়লো এবার তারাপদর ওপর। ধর্মভীরু, শান্তিপ্রিয়—এই উচ্চ শিক্ষিত মানুষটির ভাগ্যাকাশে হঠাৎ একদিন দুর্যোগের কালো মেঘ দেখা দিল। ঘটনাটা বলি।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী—তারাপদর ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটে থাকতো। মেয়েটি জাতিতে পাঞ্জাবী। বাপ পাঞ্জাবী,—সেক্রেটারিয়েটে ভাল চাকরি করেন। মেয়েটির মা বাঙালী। তিনি ছিলেন দিল্লীর কোন এক হাসপাতালের নার্স। যুবক মোহন সিং একদিন হকি খেলায় আহত হ'য়ে হাসপাতালে আসেন। সেই সূত্রে নার্স মানসী গুপ্তার সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় প্রেমে রূপান্তরিত হ'য়ে—শেষে একদিন বিবাহের মর্যাদা লাভ করলো।

এঁদেরই মেয়ে বিচিত্রিতা—এম-এ পড়ে। একদিন তারাপদ তার একতলার ফ্ল্যাটের সামনের বাগানটুকুতে সকালে পায়চারি করছে। বিচিত্রিতা সসংকোচে এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। হাই পাওয়ারের চশমা চোখে থাকায়—তারাপদ মেয়েটিকে চিনতে না পেরে চেয়ে রইল।

—আমি কি একটু ভেতরে আসতে পারি স্যার?

—কে ?

—আমি বিচিত্রিতা।

বিব্রত হ'য়ে নিজের মনে বিড় বিড় ক'রে বললো তারাপদ—

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ততক্ষণে মেয়েটি এগিয়ে এসেছে। তুটি হাত যোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বললো—আমি স্যার, আপনার ছাত্রী।

—তাই বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ইতিহাস নিয়ে এম-এ পড়ি।

—তুমি পাঞ্জাবী না বাঙালী ?

—আমি স্যার বাঙালী পাঞ্জাবী তু-ই। আমার মা বাঙালী, বাবা পাঞ্জাবী।

—বাঃ! বলে তারাপদ ভেবেই পেলো না আর কী জিজ্ঞাসা করবে। সে চুপ ক'রে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—আমার বাবা সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি স্যার।

—বলো।

—আমি যদি সকালে এক ঘণ্টা ক'রে আপনার কাছে এসে পড়ে যাই—তবে—। বাবা বলেছেন—তিনি একশো টাকা অবধি দিতে পারেন এর জন্যে।

—না না, টাকার কথা হচ্ছে না। তুমি পড়বে, তাতে—। কিন্তু—। আমার তো সময়—। আচ্ছা, তুমি এস কাল থেকে।

মেয়েটি আবার বিনীত নমস্কার ক'রে চলে গেল।

আমাদের নায়িকা এবার বিচিত্রিতা।

প্রতিদিন সকালে ঘড়ির কাঁটা ধরে আসে বিচিত্রিতা। তাকে চিত্রিতা বলে ডাকা চলে। কিন্তু সহজ হয় চিত্রা বলে ডাকলে। তার বাপ-মাও তাই বলেই ডাকে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা মেয়ে। লম্বা ছিপছিপে গড়নের অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। সাড়ে ছটায় আসে—সাড়ে সাতটায় চলে যায়। তারাপদ যা বলে, নিঃশব্দে মাথা নীচু ক'রে একমনে লিখে যায়। তারপর খাতাখানা তারাপদর সামনে এগিয়ে দেয়। তারাপদ কারেক্‌শান ক'রে দিলে খাতা নিয়ে নমস্কার ক'রে বাড়ী চলে যায়। প্রথম মাসের মাইনের একশো টাকা নিয়ে এসেছিল, তারাপদ নেয়নি। বলেছিল—

—বিদ্যা দান ক'রে পয়সা নিতে নেই। অবশ্য ইনষ্টিট্যুশনের কাছে নিতে হয়—জীবিকার জন্যে।

—ঠিক আছে। বলে টাকাটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল চিত্রা।

একদিন সকালে পড়তে এসে দেখলে—অধ্যাপক হতাশভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন।

—কী হয়েছে স্যার ?

—এস চিত্রা। এই দ্যাখো না—কী বিপদে পড়েছি।

—কেন ? কী হ'ল ?

—আমার কুক্ কেষ্ট আমাকে না বলে দেশে চলে গেছে। এতক্ষণ পরে ওর মামা এসে বলে গেল। কী করি আমি এখন !

—কী আবার করবেন ?

—তার মানে ? তুমি জানো আমি হোটেলে খেতে পারি না।

—দরকার নেই হোটেলে খাবার। কেষ্ট যে ক'দিন না আসে—

সেই ক'টা দিন আমি টিফিন কেরিয়ারে ক'রে আপনার খাবার দিয়ে যাব।

একটু কাল বোকার মতো চিত্রার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো তারাপদ—সেটা কি খুব অন্যায় হবে না?

—কিচ্ছু অন্যায় হবে না। আমি সাড়ে সাতটায় বাড়ী গিয়ে খাবার নিয়ে আসবো।

অতএব পড়াতে বসলো তারাপদ। ঠিক সময়ে চিত্রা উঠে গিয়ে বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে এল। তারাপদ স্নান ক'রে খেতে বসলো। কাছে বসে তাকে খাইয়ে বাড়ী চলে গেল চিত্রা।

এইভাবে গেল আরো একমাস।

হঠাৎ দেখা গেল—চিত্রা নিজেই বাজার ক'রে নিয়ে আসে ইউনিভার্সিটি ফেরৎ। বাজারটা দিয়ে যায় তারাপদর চাকর নকুলের হাতে। পরদিন ভোরে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পড়ে—নিজে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। ভাত, ডাল, একটা ভাজা, একটা তরকারী নামায়। নকুলকে দিয়ে বাজার থেকে মাছ আনিয়ে—তারপদর খাবার ঠিক আগে মাছের ঝোলটাও ক'রে ফেলে।

চুপ ক'রে তার দিকে চেয়ে ভাবে তারাপদ। সরোজিনীর কথা মনে পড়ে তার। এই মেয়েটি সরোজিনীর চাইতে কয়েকটা বছরের ছোট। কিন্তু কাজের ধারা একই রকম। মা বাঙালী বলে মেয়েটা পুরো বাঙালী হ'তে পেরেছে।

দিন কয়েক পরে—

হঠাৎ তারাপদ বললো—চিত্রা!

—কী স্যার?

—তোমার খাওয়াটাও কেন এই সঙ্গে সেরে নাও না!

চিত্রা চুপ ক'রে রইল। কথা এমনিতেই সে কম বলে। চুপ-চাপ কাজ করতে ভালবাসে।

—কী?

—বাড়ীতে তাহ'লে মাকে—

—বলে আসতে হবে? অফ কোর্স।

হাসলো চিত্রা। বললো—আমার খারাপ রান্না আপনার সঙ্গে বসে খেলে রেকৃটিফিকেশান হবে। তাই না?

—খারাপ রান্না? তোমার? মাই গুড্নেস। অসম্ভব ভাল রাঁধতে পারো তুমি। আমি তো এখন তুবেলা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—কেষ্ট যেন আর না আসে। কেষ্টর যেন বিয়ে হ'য়ে যায়।

—কেন? বিয়ে হ'য়ে গেলে—আর কেউ কাজ করে না বুঝি?

—না। বিয়ে করলে—নতুন বৌ নিয়ে মেতে উঠবে তো?

লজ্জায় লাল হ'য়ে মাথা নীচু করলো চিত্রা। তক্ষুণি নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে—তারাপদ বললো—

—মাপ কোরো চিত্রা। তোমার সামনে একথা বলা হয়তো ঠিক হ'ল না।

দিন সাতেক পরে তুজনে একসঙ্গে খেতে বসেছে—হঠাৎ মুখ তুলে চিত্রা প্রশ্ন করলো—

—স্যার, আপনি কি বিয়ে করেছেন?

চমকে উঠলো তারাপদ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মুখ তুলে বললো—হ্যাঁ, বিয়ে করেছিলাম।

—করেছিলাম বলছেন কেন ? আপনার স্ত্রী কি—

—হ্যাঁ। তিনি আছেন। তবে আমার কাছে নেই।

—তার মানে ? চিত্রার গলায় ঔৎসুক্য।

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারাপদ কী যেন ভাবলো। তারপর মুখ তুলে বললো—

—চিত্রা, তুমি আমার প্রিয় ছাত্রী। যে ক'রেই হোক— আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে তুমি জড়িয়ে গেছ। আমার জীবনের একটি অত্যন্ত পেইন্‌ফুল চ্যাপ্টার তোমার কাছে আজ মেলে ধরছি। শোন।

গোড়া থেকেই আরম্ভ করলো তারাপদ। শুনতে শুনতে কখন খাওয়া ভুলে গেছে চিত্রা, কখন তার দুটো চোখের কোল জলে ভরে উঠেছে—তা সে নিজেই জানে না। শুনতে শুনতে একটা অপরিসীম মমতায় বুকটা ভরে গেছে চিত্রার, কখন যে এই হতভাগ্য, বিড়ম্বিত অধ্যাপকের প্রতি তার মন ভালবাসায় ভরে গেছে—তা সে নিজেই জানে না।

বলতে বলতে তারাপদর নিজের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সে বললো—সুহাস যখন আমাকে বললো—সরোকে ছেড়ে দেবার কথা, তখন আমার মনে হ'ল—পৃথিবীর বুক থেকে সেই আদিম অন্ধকার এখনো কাটেনি। মানুষ বোধহয় এখনো সেই প্রস্তর যুগেই বাস করছে। তবু জোর ক'রে মত দিলাম। শুধু অনুরোধ করলাম—সরোকে মিষ্ট্রেস ক'রে রাখবেন না, বিয়ে করবেন। কথা রেখেছেন ভদ্রলোক। বিয়ে করেছেন সরোকে। ওদের একটি বাচ্চা হ'য়েছে—তাও শুনেছি।

চেয়ার থেকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে বাথরুমে চলে গেল চিত্রা। ফিরে এল প্রায় কুড়ি মিনিট পরে। তখন তার মুখ-চোখ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

এর পর থেকে চিত্রা তারাপদর আরো কাছে সরে এল। সে বেশীর ভাগ সময়—এ বাড়ীতেই কাটাতে লাগলো। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে একবার বাড়ী যায়, তারপর চলে আসে এখানে। পরিষ্কারভাবে তাকে দেখলে বোঝা যায়—সে তারাপদর প্রেমে পড়েছে। তারাপদকে ছেড়ে সে বেশীক্ষণ অন্য কোথাও কাটায় না।

বছর কেটে গেছে। ভাল ভাবে পাশ করেছে চিত্রা। কিন্তু এই ডিউটি তার বন্ধ হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যার পর—চিত্রা এ বাড়ীতে পৌঁছবার ঠিক পরেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। তার সঙ্গে প্রবল ঝড়। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে তারাপদ বললো—

—তুমি যাবে কী ক'রে চিত্রা ?

—তাই তো ভাবছি।

—আমি একটা ছাতা নিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো ?

—না স্যার, এই ঝড়ে ছাতা থাকবে না।

—তাও তো বটে। তাহ'লে ?

—তাহ'লে আবার কী ? আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। বৃষ্টি থামলে আমি নকুলকে ডেকে দিয়ে বাড়ী চলে যাব।

—বাঃ! কী বুদ্ধি! আমি ঘুমোব, আর তুমি জেগে থাকবে ?

—আমি ঘুমোই কম।

—কেন ?

—এমনি।

—দূর! এমনি কখনো হয় ? নিশ্চয় মাথায় কোন একটা চিন্তা ঘুরছে। কী, তাই না ?

চিত্রা কোন কথা না বলে মাথা নীচু করলো।

তবু তারাপদ বোকার মতো জেদ ধরলো—কী চিন্তা তাকে বলতে হবে। হঠাৎ কেঁদে ফেলল চিত্রা।

তারাপদ কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো চেয়ে রইল ক্রন্দসী বিচিত্রিতার দিকে। চিরকালের ভাল ছেলে সে। সারা-জীবন পড়াশুনো করেই কেটেছে। কী চিন্তায় একটি সুন্দরী মেয়ে ঘুমোতে পারে না, এবং কোন গোপন বেদনার অন্তর্দাহে—তাকে সেই প্রশ্ন করলে—সে কেঁদে ফেলে—একথা বোঝার মতো বাস্তব বুদ্ধি তারাপদর নেই। তবু সে বোকার মতো আবার জিগ্যেস করলো—

—তুমি কাঁদছো কেন চিত্রা? কী হ'য়েছে?

কোন জবাব দিল না চিত্রা।

পরদিন সকালে চিত্রা এলো না। এলো তার চিঠি। সেই চিঠিতে সে তার রাত্রে না ঘুমোনোর কাহিনী বিবৃত করেছে। শেষে লিখেছে: 'সরোজিনী তোমাকে সুখী করতে পারেনি। কিন্তু আমি পারবো। আমাকে সুযোগ দাও।

চিত্রার বাবা মোহন সিং এলেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে ওদের বিয়ে হ'য়ে গেল।

সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে সরোজিনী দিল্লীতে এল ছেলে সত্যকামকে সঙ্গে নিয়ে। সে তারাপদকে এসে ধরলো—তার ছেলের জন্য মিনিস্ট্রীতে সুপারিশ করতে হবে।

চিত্রা তারাপদকে বললো—ক'রে দাও।

নিজে গিয়ে সুপারিশ করলো তারাপদ। সে তখন ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল প্রফেসর।

সরোজিনীর প্রথম সন্তান সত্যকাম চক্রবর্তী এখন ভারত সরকারের রাষ্ট্রদূত। সম্ভবতঃ মধ্য ইউরোপের কোন দেশে সে আছে।

সুহাস এবং সরোজিনীও সেখানে।

॥ সমাপ্ত ॥